শ্রীবিমলাদাসগুপ্ত
শ্রীপ্রকাশচন্দ্রবিশ্বাস

ত্রয়ী

- - - - - - মহাত্মা গান্ধী - - -

মৌলানা মহম্মদআলি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

- - - - - জীবন-চরিত - - - - - -

শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস

চৈত্র, ১৩২৭

[দাম—আট আনা]

প্রকাশক—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ,
দি মডার্ণ পব্লিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

প্রচ্ছদপটখানি আঁকিয়া দিয়াছেন আমার প্রিয়বন্ধু প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ চারুচন্দ্র রায়। বইখানি বা'র করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন প্রিয়বন্ধু শ্রীমান্ হিতেন্দ্রনাথ নন্দী। ইঁহাদের নিকট আমি ঋণী।

চৈত্র পূর্ণিমা ১৩২৭
কলিকাতা।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস

ত্রয়ী

মহাত্মা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী

ছাত্রগণ সকলে না হউক, অনেকেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিতে নামিয়াছে, কলের মজুর, ও ক্ষেত্রের চাষারাও দল বাঁধিয়া নানা ভাবে প্রবল মালিক ও জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে এবং শিক্ষিত ধনীলোকেও ধন-মানের বোঝা দূরে ফেলিয়া দেশের কাজে চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিকে লাগাইতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের বহুদিনকার বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া একই কাজে এক সঙ্গে যোগদান করিতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। এই যে পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে ইহার অন্তরে বর্ত্তমান কালের গণতন্ত্রদেবতার শক্তি যে নাই, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যে শক্তি রুশ জাতিকে বিপ্লব ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করাইয়াছে—যে শক্তি আয়রলণ্ডে বিদ্রোহের রক্তধ্বজা তুলিয়াছে এবং কোরিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগাইয়াছে, ইহা সেই শক্তি। ভারতের বুকের উপর দিয়া অনেক অত্যাচার, অনেক অবিচার, অনেক নিষ্ঠুর নির্য্যাতন যুগে যুগে নির্লজ্জ লীলা করিয়া গিয়াছে—কিন্তু পরমসহিষ্ণু ভারতচিত্তে কোন বিক্ষোভ জাগে নাই, চিরমৌনকণ্ঠে কাতর ধ্বনি ফুটে নাই। আজ পাঞ্জাবের কথা ভারত ভুলিতে চাহিতেছেনা—মুসলমানের আপমান সহ্য করিতে চাহিতেছে না। শুধু এদেশের নয় বিদেশের ভাবুকমহলেও ভারতের

এই নব অশান্তি লইয়া নানা বিচার বিতর্ক, নানা আলোচনা ও সমালোচনা চলিতেছে। কেহ ইহাতে ভারতের আসন্ন আত্মহত্যার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া শাসনে পেষনে বা প্রলোভনে ইহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কেহ বা ইহাতে ভারতের প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্থচনা দেখিয়া অন্তরের সহিত ইহাকে অভিনন্দন করিতেছেন। বিভিন্ন মতের মধ্যেও একটি সত্য বেশ ফুটিয়া উঠিতেছে যে, ভারত চঞ্চল ও অশান্ত।

যাঁহারা এই নবচাঞ্চল্যের প্রাণ বা যাঁহাদের কর্ম্মচিন্তা ও বাণী ভারতের জনসাধারণকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধিয়া শক্তিমান করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহারই পরিচয় লইলে এই নবচাঞ্চল্যের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যাইবে। এই লোকটির নাম জানে না এমন ভারতবাসী খুবই অল্প আছে। ইঁহাকে মিত্রগণ শুধু শ্রদ্ধাভক্তি করে তাহা নহে, ইঁহার ইঙ্গিতে সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে এবং প্রাণ দিতে পারে। বিপক্ষের লোক ইঁহার কাজকে নিন্দা করিলেও ইঁহার ব্যক্তিত্বকে সম্মান না দেখাইয়া থাকিতে পারেন নাই। ইঁহার নাম মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীর অসীম সাহস—সত্যে অলৌকিক বিশ্বাস। ক্রুশবিদ্ধ যীশুজীবন বিশ্বমানবের মনে, বিশেষ করিয়া তথা কথিত খৃষ্টানদিগের হৃদয়ে স্থান না পাইলেও ইঁহার নিকট সে আদর্শ বাস্তবসত্য—প্রহ্লাদের আত্মশক্তি হিন্দুর মনে প্রবল বিশ্বাস না দিলেও এই আশ্চর্য্য লোকটির প্রাণে উহা আশ্চর্য্য ভাবে ধ্রুব হইয়া আছে।

ব্রাহ্মণের কুলে মোহনচাঁদের জন্ম হয় নাই—বৈশ্য হইলেও তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মপরায়ণ কেহ নাই—ক্ষত্রিয় না হইলেও বীর্য্যবান

তাঁহার মত কে আছে? পোরবন্দর গুজরাটের একটি সহর; পোরবন্দরে পৈত্রিক ভবনে ইং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর করমচাঁদ তনয় মোহনচাঁদের জন্ম হয়। করমচাঁদ ছিলেন দেশীয় বিভিন্ন রাজাদিগের দেওয়ান। তাঁর অর্থের চেয়ে ধর্ম্মের প্রতি টান ছিল বেশি এবং সুবিধার চেয়ে সত্যকেই তিনি জীবনে বড় আসন দিয়াছিলেন। তাই শৈশবে মোহনচাঁদকে শুধু বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; গৃহে শিক্ষক রাখিয়া ধর্ম্মপুস্তক পড়াইয়াছিলেন।

মোহনচাঁদ-জননীর সেবাহস্ত সর্ব্বদা দীন দুঃখী অথবা রোগীর রোগ দূর করিবার জন্য উন্মুক্ত ও উদারভাবে প্রসারিত ছিল। তাঁর দেবদ্বিজে খুবই ভক্তি ছিল কিন্তু ধর্ম্মের কোনপ্রকার গোঁড়ামি তাঁহার উদার অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করে নাই। স্নেহে কোমল ও শাসনে কঠোর মোহনচাঁদ-জননী সন্তানদিগের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন।

বাল্যবিবাহ কুপ্রথা বলিয়া মোহনচাঁদ আজ কতনা তীব্র-ভাষায় ইহাকে আক্রমণ করিতেছেন এবং ইহা দ্বারা ভারতের ঘোরতর অকল্যাণ সাধিত হইতেছে বলিয়া বারবার দেশবাসীকে এ প্রথা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন; কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য যে বারবছর বয়সে এক ধনীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ভারতে মোহনচাঁদ প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন—১৭ বছর বয়সে, আহমেদাবাদ ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে 'পাশ' করিয়া ব্যরিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যান। যদিও মোহনচাঁদের জননী বিলাত যাওয়ায় কোন পাপ হইবে এ ধারণা করেন

নাই তবুও পাছে পাশ্চাত্যসভ্যতার প্রবলঘূর্ণীপাকে সন্তান বিনষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় প্রথমে তিনি মত দেন নাই। অবশেষে সন্তানের নিকট হইতে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইলেন যে সে কোনদিন মদমাংস ও নারীর সংসর্গে আসিবে না, তখন তিনি মত দিলেন। গান্ধী বিলাতে কোনদিন মদমাংস বা নারীর সংসর্গে আসেন নাই—বন্ধুজনের উপরোধ ও অনুরোধ তাঁহাকে সত্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইনারটেম্পলে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া ভারতে আসিলেন—কিন্তু ভারতে আসিয়া স্নেহময়ী জননীকে দেখিতে পান নাই। মোহনচাঁদ বোম্বাই হাইকোর্টে 'প্রাক্‌টিস' করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল ট্রেন্সভাল প্রভৃতি স্থান বৃটিশ উপনিবেশ—বুয়ার জাতির প্রাধান্য এখানে প্রবল এবং ইহার রাজতন্ত্র বুয়ারজাতির ইচ্ছায় ও অভিপ্রায়ে পরিচালিত হয়। এখানে মাটির বুক চিরিয়া ফসল, বন কাটিয়া নগর ও খনির পাথর কাটিয়া সোণা ইত্যাদি বাহির করিবার জন্য ভারত হইতে বহু বর্ষ হইতে অনেক শ্রমিক লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা অনেকেই সে দেশে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বাস করিতেছে—ইহা ছাড়া অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী সেখানে ব্যবসা করেন। এই প্রবাসী ভারতবাসিগণকে নিত্যনিয়ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে গান্ধী ইংরাজি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কোনও

একটি প্রবাসী বণিকের মামলা চালাইবার জন্য নেটাল যাত্রা করেন। গান্ধী বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া বিলাতী সভ্যসমাজে মিশিয়া, সাম্য ও স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—আফ্রিকায় গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দেখিলেন—'কালার' কোনখানে স্থান নাই—হাটে বাজারে ট্রেণে ট্রামে,—এমন কি সাধারণ রাস্তাঘাটেও কালা সাদার সঙ্গে সমান আসন, সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত। ভারতের ব্রাহ্মণ যেমন 'চণ্ডালকে পারিয়াকে' দূরে রাখিয়া নিত্য অপমানের দ্বারা তাহাকে নির্লজ্জভাবে পীড়ন করিতেছে, সেখানেও বুয়ারজাতি ভারতবাসীকে ঠিক তেমনিভাবে রাখিয়াছে। তিনি আইনব্যবসায়ীর প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া নেটাল উচ্চতম বিচারালয়ে একটি দরখাস্ত করিলেন কিন্তু ইহাতেও 'নেটাল আইনব্যবসায়ী সমিতি বাধা দিবার চেষ্টা করিল। তিনি 'কালা' বলিয়া সে অধিকার যাহাতে না দেওয়া হয় এ চেষ্টা চলিয়াছিল। সৌভাগ্য ভারতের, গান্ধীর প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল। কাজ শেষ হইলে গান্ধী চলিয়া আসিতেন, কিন্তু নেটালপ্রবাসী ভারতবাসীরা গান্ধীকে রাজনৈতিক কাজ করিবার জন্য থাকিতে অনুরোধ করায় তিনি সেইখানেই থাকিলেন। বিবিধপ্রকার স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখিবার জন্য এবং অনাগত কালের নিদারুণ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া গান্ধী নেটাল জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি যে কোন কাজ করিয়াছেন তাহা বেশ বিচার বিবেচনা করিয়া করিয়াছেন ; সাময়িক উত্তেজনায় অণুপ্রাণিত হইয়া কোন কাজ কোন দিন করা তাঁহার অভ্যাস নহে। তাঁহার কার্য্যের একটি

বিশেষত্ব এই যে তিনি কাজ করিবার আগে কর্ম্মপদ্ধতি ঠিক করিয়া লন এবং ধীর অব্যাহত গতিতে, পর্য্যায়ক্রমে কাজগুলি সময় ও সুবিধা বুঝিয়া করেন। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভারতবাসীকে লইয়া সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নিজে সভার সম্পাদক হইলেন। বুয়ার সরকারকে এবং বিলাতের পার্লামেণ্ট ও জনসাধারণকে তিনি তাঁর রচনারদ্বারা, আবেদন ও নিবেদনের দ্বারা নিরন্তর ভারতবাসীর দুর্দ্দশার কথা জানাইতে লাগিলেন। বৃটিশ ঔপনিবেশিকগণ এসিয়া-বাসীগণকে যাহাতে আফ্রিকায় না রাখা হয়, যাহাতে এসিয়া-বাসী আর আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে না পায়, ইহার জন্য একটি আইনের খস্ড়া তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিল এবং ভোটের যেটুকু অধিকার ভারতবাসীদের ছিল তাহা হইতে বঞ্চিত করাও বিলের একটি উদ্দেশ্য ছিল। গান্ধীর তুমুল আন্দোলনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে বুয়ারবাসীর সে অভিলাষ পূর্ণ হইল না।

মোহনচাঁদ এই সময় একবার ভারতে আসেন, কেননা শুধু প্রবাসী ভারতবাসিগণের দ্বারায় বুয়ার জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান অসম্ভব। ভারতে প্রতিনিধিরূপে আসিলেন। প্রবাসীর সকল দুঃখ কাহিনী ধীরে ধীরে ভারতবাসীকে জানাইলেন। এই কাজের কথা যখন বিকৃত ভাবে নেটালবাসীর নিকট পৌছিল তখন তাহারাও ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল। গান্ধী যখন স্ত্রী ও পুত্রকে লইয়া ডরবণে ফিরিলেন তখন তাঁর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইল তাহা পাঠ করিলে মনে হয় আদিম অসভ্য যুগেও এমন বর্ব্বরতা ছিল না। গান্ধীর সঙ্গে সহযাত্রী কয়েকটি ভারত-বাসী ছিল। নেটালে এদিকে রটিয়া গেল গান্ধী বুয়ার জাতির

অন্ন মারিবার জন্য একদল নিপুণ ভারতবর্ষীয় শিল্পী লইয়া আসিয়াছেন। গান্ধীকে স্থানীয় পুলিশ তীরে নামিতে ও সহরে দিবালোকে প্রবেশ করিতে বারণ করিয়াছিল; কেননা কাণ্ডজ্ঞানহীন বুয়ার জনসঙ্ঘ তাঁহাকে মারিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল। গান্ধী ভয়ে পিছাইয়া যাইবার লোক নহেন, সহরে যাইবার জন্য নামিলেন। মত্ত জনতা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, অনেক কষ্টে একজন ইংরাজ মহিলা তাঁহাকে সে যাত্রা বাঁচান। এটর্ণী-প্রধান ইস্‌কম্ব সাহেবও ছিলেন জনসঙ্ঘের দিকে। সময়ে সমস্ত শান্ত হইয়া গেল। ইস্‌কম্ব সাহেব গান্ধীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং জনসঙ্ঘের সকলেই অন্যায় কার্য্যের জন্য লজ্জিত হইল। ইস্‌কম্ব সাহেব নিজে আসিয়া গান্ধীর কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়ার যুদ্ধ বাধিল। গান্ধী জানিতেন সাম্রাজ্যে সমান দায়িত্ব না লইলে দুর্দ্দিনে সমানভাবে শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে রাজার জন্য না দাঁড়াইলে সমান অধিকার দাবী করা শুধু অন্যায় নহে হাস্যস্করও বটে। কেননা রাজ্য রক্ষা করিবে রক্ত দিয়া শেতাঙ্গগণ আর রাজ্যের সুবিধাগুলি সমানভাবে ভারতবাসী ভোগ করিবে এ কেমন কথা? তিনি যুদ্ধে সেবকবাহিনী গঠন করিয়া সাহায্য করিবেন স্থির করিলেন। প্রথমে বৃটিশ সরকার গান্ধীর প্রস্তাবে রাজি হন নাই, শেষকালে মত দেন। সহস্র ভারতবাসী লইয়া নিজে নায়ক হইয়া রণক্ষেত্রে সেবার কাজে নামিলেন, রণক্ষেত্রে যে আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইলেন যেরূপ ভাবে লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্রের মৃতদেহকে সেবকবাহিনী বহিয়া আনিল সেরূপ কেহই আশা করে নাই। সমরবিভাগের কার্য্য বিবরণীতে গান্ধীর ও ভারতসেবক-

বাহিনীর প্রশংসা বাহির হইল। স্বাস্থ্যলাভের জন্য ১৯০১ সালে তিনি একবার ভারতে আসেন। তাঁহার আগমনের প্রাক্কালে বিদায় অভিনন্দন দিবার জন্য যে সভা হয় তাহাতে নেটালের প্রধান মন্ত্রী গান্ধীর প্রশংসা করিয়া একটি পত্র পাঠান এবং তিনি নিজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন।

গান্ধী ভাবিয়াছিলেন যুদ্ধাবসানে শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল বিভেদ ঘুচিয়া যাইবে এবং ভারতবাসী ও বুয়ার সমান অধিকারই পাইবে। কেননা যুদ্ধের সময় ইংরাজ জাতির মুখে ন্যায় ও সাম্যের বড় বড় কথা শুনা গিয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্দিনে যে সব কথা মানুষ বলে যে সব কর্ত্তব্য ও নীতিজ্ঞান মানুষের অন্তরে আশ্রয় লাভ করে, সুদিনে সে সব কথা মানুষের মনে থাকে না। পুনরায় পুরাতন বিভেদ নীতি প্রকাশ্য ভাবে প্রচলিত হইল। গান্ধী পুনরায় নেটালে ফিরিয়া গেলেন।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজপুরুষ চেম্বরলেন সাহেব রাজ্যশাসন পদ্ধতি ইত্যাদি ঠিক করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। গান্ধী তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। অনেক কষ্টে নেটাল অধিবাসী বুয়ার ও শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহাকে দেখা করিতে দিল; কিন্তু ট্রান্সভালে গান্ধী চেম্বরলেন সাহেবের সহিত দেখা করিবার অধিকারও পান নাই। অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতে লাগিল। তিনি ট্রান্সভালে থাকিলেন। ট্রান্সভাল উচ্চতম আদালতে 'প্রাকটিস' করিতে লাগিলেন, উদ্দেশ্য ভারতবাসী যাহাতে দুর্দ্দশার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। এখানে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান প্রধান ভারতবাসিগণকে লইয়া তিনি "ট্রান্সভাল বৃটিশ ভারতীয় সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধী

যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন তিনি সভার সম্পাদক ছিলেন। শুধু সভার দ্বারা সকলকে এক করা যায় না, সকলের মতামত জানা যায় না বা সমস্ত প্রবাসী ভারতবাসিগণের মতামত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে ; কাজেই একখানি খবরের কাগজ বাহির করিলেন। কাগজখানির নাম ছিল “ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান”। লেখা হইত ইংরাজিতে, গুজরাটিতে, হিন্দী ও তামিল ভাষাতে। সম্পাদক ছিলেন স্বর্গগত এম, এইচ, নজর মহাশয়। গান্ধী ধীরে ধীরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলেন এবং কাগজে ইংরাজি ও গুজরাটি ভাষায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই রচনাগুলিতে গান্ধীর গভীর ধর্ম্মভাব, তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজখানি চালাইতে খরচ হইতে লাগিল খুবই বেশি এবং গান্ধী দেখিলেন কাগজখানি চালান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তিনি সহর হইতে সরিয়া গ্রামের দিকে আসিলেন। ডরবান হইতে বার মাইল দূরে জায়গা জমি কিনিলেন এবং একটি আদর্শ পল্লী স্থাপন করিলেন। এই পল্লীতে কর্ম্মী কাজ করিয়া চাষ করিয়া কাগজের খরচ ও নিজেদের খরচ চালাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। কাগজের সত্ব হইল তাহাদের, জমি হইল তাহাদের। দারিদ্র্য বরণ করিয়া দেশসেবক-গণ কাজে নামিল। শুধু কাগজ চালান নহে সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার ভারও তাহারা লইল।

১৯০৪—‘প্লেগ’ আরম্ভ হইল—জোহান্সবর্গ নগরে ভারতবাসী অনেক লোকই মরিতে আরম্ভ করিল—মিউনিসিপালটি কোন নজর দেয় না দেখিয়া গান্ধী নিজেই হাঁসপাতাল করিলেন—

সেবা করিবার জন্য সেবকসঙ্ঘ গড়িলেন। মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ শেষকালে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল এবং গান্ধীর কাজের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

১৯০৬—জুলুবিদ্রোহে তাঁহার শববাহকের কার্য্য এবং তাঁহার শববাহক বাহিনীর কাজ বুয়ার সরকারকে বিস্মিত করিয়াছিল। তাঁহার কাজ দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারিত না যে তিনি বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার ও দেওয়ানের পুত্র।

গান্ধী আপদে বিপদে শ্বেতাঙ্গ ও বুয়ারদিগকে সাহায্য করিতে কোনদিন কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হন নাই—কিন্তু তাঁর কাজের বাচনিক পুরস্কার ছাড়া আর কিছু তিনি বা তাঁহার দেশবাসী লাভ করে নাই। ট্রেন্সভাল গবর্ণমেণ্ট আইন করিবার ঠিক করিলেন—যে আইনের বলে ভারতবসী সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল—বার্ষিক ৩ পাউণ্ড একটি টাক্স বসিল এবং ভারতবাসীর বিবাহকে অস্বীকার করিবার মত আইনের ধারা রহিল। প্রথমে তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন আইনের দ্বারা ভারতবাসীর কি নিদারুণ ক্ষতি হইবে, কত প্রার্থনা কত মিনতি কত অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বলের কাতর প্রার্থনা প্রায় সর্ব্বত্রই বিফল হয় সুতরাং গান্ধীর কথায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। রাজাও আইনে মত দিলেন।

গান্ধী দেখিলেন ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সভ্যতা, ভারতের জাতীয়তা ভাসিয়া যায়—ধীরে ধীরে সুনিপুন সেনাপতির ন্যায় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভারতবাসী কুলিমজুর, দোকানদার, দালাল, কেরানী মহুরি, নরনারী সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন—এবং স্বয়ং

'আইন' বলিয়া যে বেয়াইন জারি হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ১৯০৭—গান্ধী ও তাঁহার কয়েকটি সহকর্ম্মীকে জেলে যাইতে হইল। জেলে তাঁর কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু যখন শুনিলেন অন্যান্য কর্ম্মিগণকে ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে তখন তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে 'তিনি যে আইন ভাঙ্গিয়াছেন এবং তিনি নেতা বলিয়া তাহারই কঠোর সাজা হওয়া উচিত একথা জানাইলেন। তাব দুঃখ হইল তাঁর দুই মাসের বেশি জেল হইল না বলিয়া। জেনারেল স্মট সাহেব বুদ্ধিমানের ন্যায় 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের তিন সপ্তাহের পরই মুক্তি দিয়া সন্ধির চেষ্টা করিলেন। গান্ধী জেনারল স্মটকে বিশ্বাস করিয়া আইন উঠিয়া যাইবে ভাবিয়া স্মটের কথামত সন্ধি করিলেন। গান্ধীর এই আচরণ অন্ধ অনুবর্ত্তীগণকে ক্রোধোন্মত্ত করিল। তাহারা গান্ধী সরকারের কাছে তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফেলিয়া দিয়া যায়। গান্ধীকে যখন পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে যে মারিয়াছে তাহাকে দেখাইয়া দিন—গান্ধী পুলিশের কাজে সাহায্য করিলেন না—তিনি বলিলেন "তার কোন দোষ নাই, সে মনে করিয়াছিল আমি দোষী কাজেই সে আমায় মারিয়াছে তার দোষ কোথায়?" স্মট সাহেবের কথা অনুসারে শেষ পর্য্যন্ত কাজ হইল না। গান্ধী আবার 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' করিবার জন্য দেশবাসীকে ডাকিলেন। জেলে প্রত্যহ শত শত লোক যাইতে লাগিল— গান্ধীকে সরকার বাহাদুর কিছু করেন না—অথচ তাঁরই অনুবর্ত্তি-

গণকে সাজা দিতে লাগিলেন। গান্ধীর আত্মত্যাগ নির্ভীকভাবে কারাযন্ত্রণা ভোগ সার্থক হইল—স্মট সাহেব পুনরায় গান্ধীর মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন—কেননা বিলাত হইতে বৃটিশ মহাসভাও গান্ধীর কথা শুনিতে লাগিলেন। পোলক সাহেব এই সময়ে গান্ধীর সহিত ভারতের জন্য অনেক কাজ করেন।

ভারতগবর্ণমেণ্ট এদিকে স্থির থাকিতে পারিলেন না—বিলাতগবর্ণমেণ্টকে বার বার ভারতবাসীগণের প্রতি যে অবিচার হইতেছে তাহা জানাইতে লাগিলেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে ইউনিয়ান গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ পড়িল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর একেবারে যাত্রা নিষেধ না করিয়া জাতিবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আইনের খসড়া ইউনিয়ান গবর্ণমেণ্ট রচনা করিলেন। মিথ্যাকে যতই সাজাইয়া গুছাইয়া বাহির করা হউক না কেন তাহা মিথ্যাই থাকিয়া যায়। ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান সকলেই গান্ধীর কথা শুনিল এবং "মিথ্যা মিটমাটে" সম্মত হইল না। গবর্ণমেণ্ট সময় চাহিলেন—১৯১২ খৃষ্টাব্দের নূতন বিল পাশ হওয়া পর্য্যন্ত নিরুপদ্রপ প্রতিরোধ স্থগিত রাখা হয়।

এই সময়ে ভারতসেবক মহামতি গোখ্‌লে ভারতগবর্ণমেণ্টও বিলাতগবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং সুচারু ব্যবস্থার দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধির চেষ্টা করিতে তথায় যান। সত্য কথা বলিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে শ্বেতাঙ্গ বণিক শ্রমিক ও শাসক সম্প্রদায় গোখ্‌লেকে খুবই আদর আপ্যায়িত করিয়াছিল এবং 'মাথাপেছু'

যে একটা কর ছিল তাহা উঠাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিল। কিন্তু সংসারে বিশেষ করিয়া সভ্য সমাজে কথা ও কাজ বড় একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে না। একটি দেওয়ানি মামলায় বিচার হইল 'ভারতবাসীর বিবাহ অসিদ্ধ'—ভারতবাসীর অপরাধ, একাধিক রমণী বিবাহ করা—ভারতীয় প্রথা।

হিন্দুর বা মুসলমানের বিবাহ প্রথায় দোষ থাকিতে পারে কিন্তু হিন্দু মুসলমানের বিবাহ বিবাহ নহে—আর বিলাতী বিবাহই বিবাহ এ বুদ্ধিমানের বিচার ভারতবাসী কিরূপে সহিতে পারে। ভারতের ধর্ম্মকে, পতিব্রতা সতীর সতীত্বকে, এত বড় আঘাত অক্লেশে দিবার শক্তি বুয়ার জাতির ছিল, কাজেই তাহারা এইরূপ বিচার করিল। আগুন জ্বলিল, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ান সরকার বহুদিন প্রত্যাশিত নূতন বিল পাশ করিলেন। ভারতবাসীর অবস্থা কি হইল? তুমি সে তিমিরে তুমি সে তিমিরে, সেই মাথা পেছু কর রহিল, সেই সকল অসুবিধা সেই সকল অন্যায় ঠিক তেমনি রহিল, শুধু নারীদের মাথাপেছু কর দিতে হইবে না এইটুকু দয়া ছিল। গোখলে বিলাত ফিরিয়া গেলেন, ভারতহিতৈষী লর্ড এম্পিটল সাহেবের কাছেও অন্যান্য ভারতশুভেচ্ছু ইংরাজদিগের কাছে বুয়ার বিচার, বুয়ার বিধানের পরিচয় দিলেন। ইংলণ্ডে আন্দোলন চলিতে লাগিল—লর্ড সভায় বেচারা ভারতবাসীর জন্য অনেকেই বক্তৃতা দিলেন।

এদিকে গান্ধী যখন দেখিলেন কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই, প্রতিকারের কোন সামান্য মাত্র শক্তি নাই, তখন তিনি তাঁর আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। ভারতবাসী নরনারীকে

বলিলেন "উঠিয়া দাঁড়াও, ধর্ম্মের জন্য জাতীয়তার জন্য পশুশক্তির বিরুদ্ধে মহম্মদের ভক্তসন্তান, বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তসন্তান আত্মত্যাগের জন্য জীবনদানের জন্য প্রস্তুত হও। যদি মুণ্ডকর না রহিত হয়, যদি বর্ণবৈষম্যমূলক আইন না দূর হয়, যদি মনু মহম্মদ প্রবর্ত্তিত বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া না গ্রাহ্য হয়, যদি কেপরাজ্যে প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয় এবং সুবিচার যদি ভারতবাসী না পায় তবে তার মৃত্যু ভাল, তবে তার বংশলোপ হয় হউক, তবে তার সর্ব্বস্ব যায় যাউক।"

দেখিতে দেখিতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের নরনারী গান্ধীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল,—শুধু পুরুষ নয়, শুধু যুবক নয়, ভারতের নারীও আবার যুদ্ধে স্বামী পুত্রের সহায় হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। গান্ধী সকলকে নিউক্যাসাল সহরে ডাকিলেন, ভারতবাসী সকলেই পুত্র কন্যা স্ত্রী লইয়া নিউক্যাসাল সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারত ইতিহাসের পুণ্য দিন, সেই দিন গান্ধী ভারতবাসীকে আইন অমান্য করিয়া ট্রান্সভাল প্রদেশে প্রবেশ করিতে বলিলেন—গান্ধী নিজে আগে আগে চলিলেন, পরিধানে সামান্য বস্ত্র, আহার্য্য সকলকার সমান, পশ্চাতে দলে দলে শত সহস্র ভারতবাসী চলিতে লাগিল। নিশীথে ভূমিশয্যা, উপরে নীলাকাশ, নিম্নে মাতা বসুন্ধরার ক্রোড়ে কখনও বসিয়া বিশ্রাম করিয়া কখনও শয়ন করিয়া সকলে চলিতে লাগিল।

প্রথমে 'ইউনিয়ান' সরকার গান্ধীর অনুবর্ত্তীগণকে নানা উপায়ে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না দেখিয়া গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিলেন।

কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না। এইরূপে দুই তিন বার তাঁহাকে ধরা হয় ও অসুবিধা দেখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্ট দলে দলে লোক ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তবুও ভারতবাসীরা স্থির ধীরভাবে ধর্ম্মঘট করিয়া আইন ভাঙ্গিতে লাগিল। দেশহিতৈষী রতন তাতা প্রভৃতি লোক ভারত হইতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। ভারতের সকলস্থানেই দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচার কাহিণী গোখেল ইত্যাদি দেশসেবক-গণ প্রচার করিতে লাগিলেন। ভারতেও অশান্তি জাগিয়া উঠিল—কিন্তু উদার দূরদর্শী শাসন কর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবাসীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি বিলাত-গবর্ণমেণ্টকে শীঘ্র বুয়ার-বর্ব্বরতার প্রতিবিধান করিবার জন্য একটি কমিটি বসাইতে বলিলেন। লর্ড এম্পটিল কমিটির সভাপতি হইলেন। ভারত-জনহিতৈষী শ্রদ্ধেয় এণ্ড্রুজ ও পিয়ারসন সাহেব শান্তির জন্য অনেক চেষ্টা করেন। গান্ধীরই জয় হইল। তাঁহার পনর মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল, তাহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি মুক্ত হন। তাঁহার কারা-কাহিণী পাঠ করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা-যায় তাঁর আত্মশক্তিতে কত বিশ্বাস এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তি কি আশ্চার্য্যভাবে তাঁহাকে সমস্ত বাধা হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইংরাজি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসী যে সমর আরম্ভ করিয়াছিল তাহা শেষ হয়। ভারতবাসীর সকল-প্রার্থনাই রক্ষাকরা হয় এবং যে জেনারল স্মট গান্ধীকে সাজাদিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই, তিনিই তাঁহাকে ভারতবাসীর কল্যাণচেষ্টায় সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন বলিয়া পত্র দেন। আট বৎসর অবিরাম সমর

করিয়া ত্যাগের দ্বারা গান্ধী যে জয়লাভ করেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত কাজ, আর এই যুদ্ধে যাহারা জীবনদান করিয়াছিল যাঁহারা সত্যকে জয়যুক্ত না দেখিয়া সেই সুদূর আফ্রিকায় প্রাণত্যাগ করিল তাঁহাদের যেন আমরা না ভুলি, আর সেই ভারতের বীরবালা কুমারী ভালিয়াম্মা জেলের নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার ধাক্কা সহ্য করিতে না পারিয়া কারাবাস অন্তে ভারতের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তাহাকে যেন আমরা না ভুলি। আর আমাদের সেই পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ হরবৎসিংও ডার্ব্বান কারাগারেই স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল তাহাকে আমরা কি ভুলিব ?

ভারতবর্ষে।

দীর্ঘকালের কর্ম্ম অন্তে দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ভারতজন-নায়ক গান্ধী বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাতে রোগশয্যায় শয়ান গুরু গোখলেকে দেখিতে যাওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে য়ুরোপের রণক্ষেত্রে সেবা-পরিচর্য্যা করিবার জন্য ভারত-সেবক বাহিনী গঠন করিতে হইল। মনের সহিত দেহের শক্তি সমান থাকিলে গান্ধীকে ভারতে ফিরিতে হইত না। দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কাজেই স্বাস্থ্য লাভের জন্য ইংরাজী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল।

বিদেশ হইতে বিজয়ী প্রত্যাগত বীরকে ভারতবাসী শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিল। এমন কি ভারতসরকারও দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কাইসর হিন্দ পদক উপহার

দিয়া গান্ধীর কার্য্যের প্রশংসা করিলেন। গোখলের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন "এক বৎসর ভারতভ্রমণ না করিয়া ভারতের অর্থ-নৈতিক সমাজনৈতিক ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা নিজে না বুঝিয়া না দেখিয়া কোন কার্য্য করিবেন না।" গোখলে শিষ্যের কার্য্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই ইহা আমরা জানি, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন শিষ্যের কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী তাঁহার কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দেশ সেবার জন্য বক্তৃতা দিতে দেশের অনেক নেতাই প্রথম-শ্রেণীতে ট্রেণে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং দেশের টাকায় উত্তম পোষাক পরিধান, উত্তম ভোজ্য আহার যে করেন নাই ইহা স্বীকার করা যায় না। গান্ধীর পোষাক জেলকয়েদীর ন্যায়, আহার ও দরিদ্রদেশবাসী শ্রমিকদেরই মত। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন দরিদ্রদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে। একটি ঘটনা বেশ মনে পড়ে, গান্ধী কলিকাতায় আসিবেন, হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি জননায়কগণ অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছেন। ট্রেণ আসিয়া থামিল, প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসু মহাশয় ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকনায়কগণ গান্ধীকে খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু গান্ধী হাসিতে হাসিতে মুটে মজুরদিগের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নিজের মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাংলা কেন ভারতের একদল লোকের ধারণা ছিল গুপ্তহত্যা ডাকাতি ইত্যাদি করিলে দেশ স্বাধীন করা যাইতে পারে। গান্ধী তরুণ বঙ্গবাসী ও সেই সঙ্গে

ভারতবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে হত্যার দ্বারা কোন প্রকৃত বড় কাজ হয় না। কি হিন্দু কি মুসলমান কোন ধর্ম্মেই হিংসা কর একথা বলে নাই, সুতরাং হিংসা করিও না। যে হিংসা করে হিন্দুধর্ম্ম তাহাকেও ভালবাসিতে বলিতেছে। তোমরা প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে জয় কর, ত্যাগের দ্বারা পশু-শক্তিকে পরাস্ত কর।" পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা দেশের অকল্যাণ করিতেছে এবং সেই জন্য দেশের ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত ও সচেতন করিবার জন্য, তিনি সত্যগ্রহাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আহমেদাবাদে এই আশ্রমে কঠোর কায়িক পরিশ্রমসাধ্য কাজ শিক্ষা করিতে করিতে ছাত্রগণ বিদ্যালাভ করিতেছে। শৈশবেই ছাত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য লওয়া হয় এবং শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতামাতার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ও দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য শিক্ষাও ছাত্রগণকে দেওয়া হয়।

মোহনচাঁদের দৃষ্টি শুধু শিক্ষা বিভাগের দিকেই পড়িল তাহা নহে, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ তাহা নহে। তিনি দেখিলেন ভারতের ব্রাহ্মণ মানুষকে পশুর অধম করিয়া রাখিতে লজ্জা বোধ করে নাই; নারীকে সকল শিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া সেবাদাসী করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তিনি প্রকাশ্য সভাতে মান্দ্রাজে একটি বক্তৃতাতে বলিলেন, "আমি যতদুর হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় এই জঘন্য জাতি-বৈষম্য, ছুৎমার্গ ইত্যাদি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। যদি কেহ প্রমাণ করেন

ইহা হিন্দু ধর্ম্মেরই মূল ও প্রধান অংশ তবে সেই দিন হইতে আমি হিন্দু ধর্ম্মদ্রোহী হইব।" ব্রাহ্মণের জন্য প্রাধান্যকে তিনি তীব্র ভাষায় বর্ণনা করিয়া ব্রাহ্মণকে শূদ্রের সহিত একই স্থানে নামিয়া আসিতে বলিয়াছেন।

শুধু জাতিভেদ, শুধু ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দোষ দেখাইয়া তিনি নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। একটি তথাকথিত নীচবর্ণের বালিকাকে তিনি নিজ কন্যার ন্যায় পালন করিতেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধী মোহনচাঁদ মেয়েদের ইংরাজি শিক্ষা দিবার দিকে কোন বিশেষ চেষ্টা করিতে দেশবাসীকে বলেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি একথা বলিয়াছেন যে, নারীকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে। তিনি মনে করেন যে, নারীকে অর্থের জন্য জীবিকার জন্য জীবন সংগ্রামে যাহাতে ঝাঁপাইয়া না পড়িতে হয় সেদিকে পুরুষের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং জীবন সংগ্রামে না নামিতে হইলে ইংরাজি শিক্ষার কোনও প্রকার প্রয়োজন নাই। কিন্তু একটি কথা এইখানে ভুলিলে চলিবে না, গান্ধী মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে একই কলেজে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। এই যে ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে শিক্ষাদিবার কথা বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উদার উন্নত চরিত্রের ও দিব্য দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে তিনি মুসলমানের সহিত হিন্দুকে ভ্রাতৃভাবে মিলিতে এবং মিশিতে বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবনেও তিনি হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, বিচ্ছেদ যাহাতে গড়িয়া উঠে এমন কিছু করেন নাই।

পরমদেবতা বিধাতাকে তিনি কোন বিশেষ জাতির ও বিশেষ ধর্ম্মের ভিতর দিয়া না দেখিয়া নরসমাজে কল্যাণ কর্ম্মে ও সত্যের মাঝেই দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্যসভ্যতার বিরুদ্ধে তাহার অক্লান্ত সংগ্রাম করিবার প্রধান কারণ; যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে শ্রমিক প্রাণ হারাইতে, মান হারাইতে বসিয়াছে। ভারতে যাহাতে যান্ত্রিক সভ্যতা না চাপিয়া বসে, বণিক সভ্যতায় ভারত বহুশতাব্দীর আধ্যাত্মিকসত্বা যাহাতে না হারাইয়া ফেলে এই জন্য তিনি ভারতবাসিকে নিত্যই সাবধান করিতেছেন। দেশী হাতে বোনা কাপড় ভিন্ন তাঁহার অঙ্গে অন্য কোন বসন কেহ দেখিতে পাইবেন না। স্বদেশের শিল্পসম্পদ বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু কলকারখানার সৃষ্টি হউক এ ইচ্ছা তাঁহার নাই।

নীল আবাদ করিত বিহারের গরিব চাষা, আর পয়সা করিত শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়াল। অন্যায় করিতে, অত্যাচার করিতে, কোন দিন কুঠিয়াল সাহেবের মনে একটু দয়া একটু অনুকম্পা জাগিত না। ইংরাজি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গান্ধীর হস্তে বিহারবাসী চাষীর অবস্থা দেখিবার ও ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করা হইল। গান্ধী তেমন লোকই নহেন যে নিজে বেশ ভাল করিয়া না দেখিয়া না বুঝিয়া কোন কাজ হাতে লন। যাহাহউক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল মজফ্‌ফরপুর রওনা হইলেন। পথে মতিহারি যাইবার সময় হুকুম হইল "চম্পারণত্যাগ করিয়া যাও তোমার আবির্ভাবে প্রজার শান্তি নষ্ট হইবে।" ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম মান্য করিতে হইলে গান্ধীর কর্ত্তব্য কাজ করা হয় না, সুতরাং তিনি আইন অমান্য করিয়া কাছারিতে সাজা লইবার

জন্য উপস্থিত হইলেন তাঁর পত্রের মর্ম্ম এই যে "সাধারণের প্রতি যে কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি তাহা করিতে হইলে জেলা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অসম্ভব। আমি আইন অমান্য করিয়া যে সাজা পাইব তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। কমিশনার বাহাদুরের কথা কোন ক্রমেই সত্য নহে, আমি শুধু প্রজার অবস্থা দেখিতে ও জ্ঞানলাভ করিতে আসিয়াছি। অশান্তির সৃষ্টি করিতে আসি নাই, আমি এ কাজ যতক্ষণ মুক্ত থাকিব, করিব।" ১৮ই তারিখে সমস্ত ভারত তাঁহার কি সাজা হয় জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। গান্ধীর সাজা হয় নাই, বরং ভারতসরকার-বাহাদুর প্রজাদের অবস্থা প্রকৃত ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য 'চম্পারণ কমিশন' বসাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। কমিশনের কাজ শেষ হইলে গান্ধীর কার্য্যকে সরকার বাহাদুরও প্রশংসা করেন এবং আইন দ্বারা চাষাদেরও অবস্থা পরিবর্ত্তন করা হয়। পুরুষসিংহ গান্ধীর কাজে দরিদ্র রায়ত বাঁচিল এবং ভারতপ্রবাসী ইংরাজ কুঠিয়ালদের কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রভুত্ব ও অত্যাচার শেষ হইল। অসহযোগের প্রধান প্রবর্ত্তক ও প্রচারক মহাত্মা গান্ধী সরকার বাহাদুরের সহিত যুদ্ধের সময়ে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। দিল্লীতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যে মন্ত্রণা সভা হয় তাহাতে গান্ধী উপস্থিত ছিলেন এবং যে সভায় রাজা মহারাজা সরকার বাহাদুরকে ধনের দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই সভায় গান্ধী ভারত-দরিদ্র তাহার পক্ষে অর্থ সাহায্য করা অসম্ভব একথা বলিতে ভুলেন নাই এবং লোক-

বলের দ্বারা ভারত সাহায্য করিবে একথা বলিয়ছিলেন। সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যে গান্ধীর পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমে গুজরাটের কয়রা জেলায় অজন্মা হয় এবং তাহার ফলে অন্নকষ্ট হয়। অন্নের অভাবে লোক অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল, তাহার উপর আবার সরকারের খাজনা দিতে হইবে। বেচারা রায়তরাত কিছুই ঠিক করিতে পারে না কি করিবে। 'মা বাপ' সরকার ইচ্ছা করিলে খাজনা না নিতে পারিতেন—কিন্তু গান্ধী যখন গুজরাট সভার মারফতে কমিশনার সাহেবের কাছে কয়রারায়তের দুর্দ্দশার কথা জানাইতে গেলেন, তখন প্রাট সাহেব তাহাতে কাণ দিলেন না। গান্ধী রায়তদিগকে খাজনা দিতে বারণ করিলেন। সকলকে সত্যগ্রহী হইতে বলিলেন। সরকারের লোক আসিয়া প্রজাদের জিনিষ পত্র বিক্রয় করিতে লাগিল, তবু কেহ খাজনা দেয় না—যাহার সামর্থ্য আছে সেও দেয় না। সকলে নীরবে সরকারবাহাদুরের সকল কাজই দেখিয়া যাইতে লাগিল। চাষার বলদ গেল—জমি গেল শেষকালে বাড়ীঘরও অনেককে ছাড়িতে হইল, তবু কেহ চঞ্চল হইল না। গান্ধী বলিয়াছিলেন "অন্যায় ভাবে সরকার খাজনা আদায় করিবে সে খাজনা তোমরা দিলে অন্যায় ও অধর্ম্ম করিবে, তোমাদের কাজে সমস্ত ভারতই অবনত হইয়া যাইবে। সত্যে বিশ্বাস করিয়া সহ্য কর জয় হইবেই হইবে।" শেষকালে বাস্তবিকই গান্ধীর কথাই সত্য হইয়াছিল। সরকারবাহাদুর প্রজার খাজনা মাপ করিয়াছিলেন।

আহমেদাবাদে কলের শ্রমিকগণ মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া

খাটিত, কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না, যা মজুরি পাইত তা অতি সামান্য। মহাত্মা গান্ধী এই জন্য যাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহাদের সত্যে স্থির বিশ্বাস রাখিয়া নির্ভীকভাবে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে না পারিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামায় শ্রমিকরা মাতিয়া উঠে। গান্ধী শ্রমিকদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজেই উপবাস আরম্ভ করিলেন। গান্ধী অন্নগ্রহণ করেন নাই—শুনিয়া কলের মালিকগণ ও অনুতপ্ত শ্রমিকগণ শেষকালে তাঁহারই কথামত সমস্ত গোলমাল মিটাইয়া ধর্ম্মঘট ছাড়িয়া দিল। এই কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন কুমারী অনুসূয়া বাই। ইনি মহাত্মারই একজন প্রিয় শিষ্যা।

ভারতে রাজবিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য—সরকার বাহাদুর একটি আইন প্রণয়ন করেন। ইহার উদ্দেশ্য রাজবিদ্রোহ অপরাধে যাহাদিগকে সরকার বাহাদুর অপরাধ করিয়াছে ভাবিবেন, তাহাদের সাধারণ ভাবে বিচার না করিয়া এই আইনের সাহায্যে বিশেষ ভাবে বিচার করা হইবে। এই আইনের 'খসড়া' যখন লাট দরবারে আইনে পরিণত করিবার জন্য উপস্থিত করা হইল, তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দেশীয় প্রতিনিধিবর্গ খসড়াটির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদে কোন ফল হয় নাই—বিভিন্ন স্থানে সভা হইতে লাগিল সংবাদপত্রে 'বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলিতে লাগিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পণ্ডিত মদনমোহন ও শাস্ত্রীমহাশয় 'বিলের' বিরুদ্ধে লাট সভায় বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু সরকার বাহাদুর কাহারও

কথা না শুনিয়া 'রউলাট আইন' 'পাশ' করিলেন। যখন আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইল, যখন লোকমতকে সরকার বাহাদুর গ্রাহ্য করিলেন না, তখন গান্ধী সত্যগ্রহের দ্বারা আইনটিকে উঠাইয়া দিবেন বলিয়া দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। যখন দেখিলেন আইনের দ্বারা ভারতবাসীর ন্যায় বিচার লাভের কোন আশা নাই, তখন তিনি অন্যায় আইন গুলিকে ভাঙ্গিবার এবং কারাগারে যাইবার জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশবাসীকে সত্যগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। ৬ই এপ্রিল রবিবারে ভারতবাসীকে উপবাস উপাসনা ইত্যাদির দ্বারা সত্যগ্রহ দিবস পালন করিবার জন্য গান্ধী অনুরোধ করিলেন। সে দিন সমস্ত দোকানপাট সমস্ত কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিবার ঠিক হইল। দিল্লীতে পুলিশের সহিত নাগরিকদের যে দাঙ্গা ঘটিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। পুলিশের শান্তি রক্ষার জন্য গুলিচালান প্রয়োজন (?) হইয়াছিল। সৈন্যগণ জনতার উপর গুলি চালাইয়াছিল। সরকারবাহাদুর হইতে বলা হয় যে, জনতা উৎশৃঙ্খল হইয়াছিল শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল কাজেই বিনারক্তপাতে বিনা অস্ত্রাঘাতে শান্তি রক্ষা করা যাইত না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কিন্তু এ বাক্যের মধ্যে সত্য কিছু নাই এই ভাবেরই কথা বলিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের সত্যগ্রহসভা কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। গান্ধী নিখিলভারতীয় সত্যগ্রহ সভার সভাপতিরূপে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রচার করিতে এবং রেজিষ্ট্রি না করিয়া সংবাদপত্র বাহির করিলেন।

তাঁহার প্রথম পুস্তক "সত্যগ্রাহী" বাহির হইল। তিনি নিজেই বইখানি লইয়া অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নেতাদিগের সহিত বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে বাহির হইলেন। পথে বাহির হইতে না হইতেই তাঁহার পুস্তক লোকে শত সহস্র কিনিতে আরম্ভ করিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "সম্পাদককে যে কোন মুহূর্ত্ত ধরিয়া জেলে দিতে পারে, সুতরাং বরাবরই যে বইগুলি বাহির হইবে এ কথা সম্পাদক বলিতে পারেন না, বিশেষত যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক সম্পাদক জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাজে না নামেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না। আমরা যতদিন পর্য্যন্ত না রাউলাট আইন তুলিয়া দেওয়া হয় ততদিন এইভাবে কাগজ ও পুস্তিকা বাহির করিব।"

পাঞ্জাবের অবস্থা নিজে দেখিবেন বলিয়া মহাত্মা গান্ধী দিল্লী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দিল্লীতে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই, এমন কি পাঞ্জাবে তাহাকে প্রবেশ করিতে ও দেওয়া হয় নাই। কোসি ষ্টেশনে তাঁহাকে পাঞ্জাব সরকারের 'পাঞ্জাব প্রবেশ নিষেধ' পরওয়ানা জারি করা হইয়াছিল। তিনি পুলিশের কর্ম্মচারিকে ধীর ও শান্তভাবে বলিলেন "পাঞ্জাব না প্রবেশ করিলে এবং সরকারের জুলুমি আইন না অমান্য করিলে, কর্ত্তব্যের অবহেলা করা হইবে। সুতরাং তিনি পাঞ্জাব প্রবেশ করিবেই।" পুলিশের কর্ম্মচারিকেও তাহার নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে বলিয়া, তিনি পাঞ্জাবে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পুলিশ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় বোম্বায়ে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। গান্ধী বন্দী হইবার পুর্ব্বে দেশবাসীকে শান্তভাবে

নীরবে সমস্তই সহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীর প্রতি সরকারের ব্যবস্থা যখন লোকের কানে গেল যখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসমাজ শুনিল তাঁহার পাঞ্জাব প্রবেশ অধিকার নাই, তখন অশিক্ষিত সমাজ সত্যগ্রহের মর্ম্মকে উত্তেজনায় ভুলিয়া গেল এবং নানাস্থানে উন্মত্তের মত অন্যায় আচরণে মাতিয়া উঠিল। আহাম্মদাবাদ, কলিকাতা, ও অন্যান্য স্থানে রক্তপাত হইয়াছিল এবং গান্ধীর ভক্ত বলিয়া যাহারা নিজেদের মনে করিত, তাহারাও সেই রক্তপাতে কোন না কোন রকম ভাবে যোগ দিয়াছিল। মহাত্মা এই নিদারুণ সংবাদে তিন দিন উপবাস করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

পাঞ্জাব অশান্ত হইয়াছিল। গান্ধীর প্রতি ব্যবহার পাঞ্জাবকে বিচলিত করিল। পাঞ্জাবের লাট মাইকেল ওডায়েরের হুকুমে ডাক্তার সত্যপাল ও কীচলু মহাশয়কে ধরা হইল। এই দুইজন নেতা পাঞ্জাবের জনসাধারণের জন্য হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য কাজ করিতেছিলেন। লোকের মনে সরকারের কাজ নিদারুণ আঘাত দিল। তাহারা 'হরতাল' করিয়া সভা সমিতি করিয়া লাটের বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। লোকে স্থির থাকিতে পারিল না—সরকারও স্থির থাকিতে পারিলেন না। আগুন জ্বলিয়া উঠিল, মত্তজনতা ব্যাঙ্ক ভাঙ্গিতে লাগিল ঘর পোড়াইতে লাগিল এবং আরও যে সব কাণ্ড করিল তাহাতে ভারতবাসীর গৌরবের কিছু নাই। কিন্তু সরকার বাহাদুর যে কাজ করিলেন তাহার তুলনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "সভ্য জগতের কোথাও নাই।" জালিনওলাবাগে একটি মেলাতে প্রায় ২০০০ হাজার

লোক আসিয়া ছিল। সে দিন পর্ব্বদিন।" পল্লীগ্রাম হইতেই লোক আসিয়াছিল বেশী। জেনারল ডায়ার সাহেব হুকুম দিলেন গুলি চলিতে লাগিল, ছেলেমেয়ে মরিল, বালক বৃদ্ধ মরিল। নিরীহ বেচারাদের রক্তে ধরণী অভিসিক্ত হইল। কর্ণেল জনসেন ও রসওয়ার্থ স্মিথ সাহেব যে ভাবে সামরিক আইনের বলে পাঞ্জাববাসীকে শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার বর্ণনা করাও পাপ। লোককে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত, ছাত্রদিগকে গ্রীষ্মের রৌদ্রে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া হাজরি দেওয়ান— নারীদিগের প্রতি যে ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা বলিতেও লজ্জা হয়। আর পাঞ্জাবের বর্ত্তমান মন্ত্রী হরকিষণলাল প্রভৃতিকে যে ভাবে বন্দী করা হয় তাহা আর লিখিয়া কোন ফল নাই। সামরিক বিচারের বিধানে ছোট ছেলেরও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দ্বীপান্তর ইত্যাদি হইতে লাগিল। রাস্তায় 'নাক খত দেওয়া' ইত্যাদি ধরণের নানা অমানুষিক ব্যাপার জোর করিয়া সামরিক বিভাগের কর্ত্তারা চালাইতে লাগিলেন। পাঞ্জাবের অত্যাচার কাহিনী শুধু ভারতের নয় বিশ্বের সভ্য সমাজ বৃটিশ ন্যায়, বৃটিশ বিচার ও বৃটিশ পদ্ধতিকে বিস্ময়ে বর্ব্বর বলিতে দ্বিধা বোধ করিল না।' ইংরাজ রাজপুরুষগণও পাঞ্জাবের অমানুষিক কাণ্ডকে নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু হইলে কি হয় অন্যায়—ইংরাজ জাতি বর্ত্তমানকালে ন্যায়-নীতির পক্ষপাতী একথা সকলে বলিতে পারিবেন না। বিশেষত পার্লামেণ্ট মহাসভায় ডায়রকে সাজা দিবার প্রস্তাব উঠান হইলে, লর্ড সভার বেশীর ভাগ সভ্যই ডায়ারি কীর্ত্তি ও ওডারি

শাসনকে সমর্থন করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিলেন না। হাণ্টার সাহেব সভাপতি হইলেন, একটি তদন্ত কমিশন বসিল। তদন্তর ফল বাহির হইল, বিশ্ব লজ্জায় ঘৃণায় চক্ষু মুদিল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে তদন্ত কমিশন বসিল গান্ধী তাহাতে কাজ লইলেন। এক হাজার সাত শত লোকের এজাহার ও সাক্ষ্য লওয়া হইল, তাহাতে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা গেল ডায়ার ওডার নাদীর জঙ্গিসকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহাদের রক্তলোলুপতার তুলনা পাওয়া ভার। গান্ধীর কংগ্রেস তদন্ত কমিশনের কাজ সকলের নিকটেই প্রশংসা পাইয়াছে।

পাঞ্জাব শাসন কার্য্যে বৃটিশ জাতির ন্যায় সুবিচারের বড় বড় কথা যে কেবল মাত্র ফাঁকা কথা তাহা বুঝা গেল। লালা লজপতরায় মণ্টেগু সাহেবের নব প্রবর্ত্তিত শাসন পদ্ধতি অনুসারে যে সব 'কাউন্সিল' গঠিত হইল, তাহাতে ভারতবাসী যাহাতে কেহই না প্রবেশ করেন 'মেম্বর' হন এই উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ করিলেন। গান্ধী মুসলমানদের 'খালিফৎ সমস্যা' সমাধানের জন্য ইতি পূর্ব্বেই সত্যগ্রহ অবলম্বন করিবার জন্য সাধারণকে আহ্বান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কাজেই তিনি লালা লজপতের আহ্বানে সহজেই সাড়া দিলেন। তিনি ২০শে জুলাই তারিখে যে পত্রটি বাহির করেন, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার এ বিষয়ে মতামত জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি কাউন্সিল বয়কট করা সম্বন্ধে লালাজির সহিত এক মত। কেননা আমার পক্ষে অসহযোগিতার ইহা প্রথম ধাপ। আমি পাঞ্জাব ও খালিফৎ সম্বন্ধে লালাজির মতই প্রাণে আঘাত পাইয়াছি। খালিফৎ সমস্যা

ও পাঞ্জাবের পৈশাচিক কাণ্ড বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে ভারতবাসীর মতের কোন দাম বৃটিশ রাজসভায় নাই। ইহা আমাদের পক্ষে অপমানজনক অবস্থা। যদি আমরা এই সব জঘন্য বর্ব্বরতার প্রতিবিধান না করিয়া চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে 'রিফর্ম' আমাদিগকের অবস্থা কেমন করিয়া ভাল করিবে? আমাদের জঘন্য দাসত্ব দূর করিবার ও যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার অসহযোগ ছাড়া অন্য উপায় নাই।'

মন্ত্রী যাহা বলিলেন করিতে পারিলেন না, বড়লাট যাহা বলিলেন তাহা হইল না দেখিয়া, মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদিগের জন্য পাঞ্জাব ও সেই সঙ্গে ভারতের জন্য 'অসহযোগিতা'ই যে একমাত্র উপায় তাহা স্থির করিলেন। আমাদের বর্ত্তমান বড়লাটকে একটি পত্র দিলেন তাহার—মর্ম্ম "অসহযোগ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নাই যাহা দ্বারা সরকার বাহাদুরকে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান তাহাদের প্রকৃত অধিকার দেওয়াইতে বাধ্য করিতে পারে। অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে প্রজারা এই একমাত্র উপায়ে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। যে শাসন অন্যায়ের নামান্তর মাত্র তাহাতে প্রজারা কোন সাহায্য করিবে না। আমি জানি ইহার বিপদ অনেক, বিশেষতঃ অশিক্ষিত জনসঙ্ঘের পক্ষে অসহযোগিতা সকল সময়ে অহিংসা প্রকৃতি বজায় নাও রাখিতে পারে। আশা করি আমরা কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে এই কাজ করিতে বাধ্য হইতেছি এই কথা স্বীকার করিবেন।"

গান্ধীর অহিংসা অসহযোগ পদ্ধতি কি? তিনি অসহযোগকে চারটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) সরকার প্রদত্ত উপহার-উপাধি

ইত্যাদি বর্জ্জন (২) সরকারের বেতনিক বা অবৈতনিক কোন কাজই না করা (৩) সরকারকে খাজনা না দেওয়া (৪) পুলিশ ও সৈন্যগণকে সরকারকে সাহায্য না করিতে বলা। শুধু কেবল মাত্র উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া গান্ধী এই কাজে নামেন নাই। গান্ধী উকিলদের কাছারি, ছাত্রদের কালেজ, মাতালদের মদ ব্যবসাদারদের বিদেশী দ্রব্যের ব্যবসা ছাড়িতে বলিয়াছেন। তিনি অহিংসা অসহযোগ প্রচার করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। এই কাজে তাঁহার প্রধানসহায় ও সঙ্গী হইলেন মুসলমান দেশভক্ত আলি ভ্রাতাদ্বয়। নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া, তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা "ইয়ঙ্গ ইণ্ডিয়া"তে প্রবন্ধ লিখিয়া অসহযোগের মর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা তাঁহার অসহযোগ প্রস্তাব তুলিলেন। মালব্য, পাল, দাশ, জিন্না প্রভৃতি অসহযোগের বিরুদ্ধে না হইলেও গান্ধীর প্রস্তাবে সম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদন করিলেন না। নানা বিচার বিতর্কের পর কিন্তু গান্ধীরই জয় হইল,—বেশির ভাগ লোকই তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিল। এমন কি সভাপতি মহাশয় নিজে অসহযোগের সপক্ষে মত দিলেন, যদিও তিনি স্কুল কালেজ ত্যাগ করার সপক্ষে ছিলেন না। কাউন্সিলে কেহ যাহাতে না যায় এ প্রস্তাবেও দাশ মহাশয় ও বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মত দিলেন না, কিন্তু লোকমত গন্ধীর প্রস্তাবকেই সমর্থন করিল, এবং কলিকাতার বিরাট কংগ্রেস 'গান্ধী মহারাজকি জয়' রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। তিনি লোক মতের দ্বারা কংগ্রেসে জয়লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা তিনি বলিতে ভুলিলেন না যে কংগ্রেস কাহাকেও বাধ্য করিয়া

তাঁহার প্রস্তাবগুলি মানিতে বলিতেছে না। তাঁহার অহিংসা অসহ-যোগ প্রস্তাব নাগপুর কংগ্রেসে সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভয় হইয়াছিল পাছে চিত্তরঞ্জনের সহিত মতভেদ হওয়ায় গান্ধীর অহিংসা অহসযোগ-নীতি প্রবর্ত্তনে বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় চিত্তরঞ্জন গান্ধীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। মতিলাল নেহরু, লালা লজপত রায়, মহম্মদ আলি, চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য জননেতা গান্ধীর মত অনুসারেই কাজ করিতেছেন।

চরকা চালাইয়া দেশের কাপড় দেশের লোকে বয়ন করুক, কালেজ ও কাছারী ত্যাগ করিয়া দেশের লোক দেশের কাজ করিতে থাক, ইহাই মহাত্মার নিবেদন। ধীরে ধীরে সরকারের শাসনযন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লইলে সরকারের কাজ চলিবে না তখন হয়ত সরকার বাধ্য হইবেন সন্ধি করিতে। দেখিতে দেখিতে মদের আয় কমিতেছে, দেখিতে দেখিতে লোকের ঘরে ঘরে চরকা চলিতেছে এবং ছাত্ররাও কালেজ ছাড়িতেছে আর বাংলার আইন-ব্যবসায়ীদিগের অগ্রণী চিত্তরঞ্জন ব্যবসা ছাড়িয়া কাজে নামিলেন। শুধু চিত্তরঞ্জন মতিলাল নহেন আরও অনেকেই ওকালতি ছাড়িয়াছেন ও ছাড়িতেছেন। তিনি বলিয়াছেন "তোমরা এক বৎসরে স্বরাজ পাইবে।" আমরা ভাবিয়া পাই না একি কথা ? একি সম্ভব। তিনি কাজ করিতেছেন আজ পাঞ্জাবে, কাল বোম্বাই, পরশু মান্দ্রাজ যাইতেছেন, আমরা শুধু দেখিতেছি।

ছোট করিয়া কাজের তালিকা দিয়া ভারতের ঋষি ভারতের কর্ম্মসন্ন্যাসী গান্ধীর পরিচয় দিয়া শুধু অপরাধই করা হয়, কেননা তাঁহার পরিচয় লইতে হইলে শুধু তাঁহার কাজগুলিকে দেখিলেই

চলিবে না। তাঁহার কাজের পিছনে, তাঁহার কথার আড়ালে যে মানুষটী গোপন রহিয়া গেল তাঁহাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। সত্য তিনি বিদ্রোহের অবতার, সত্যবটে তিনি সমাজ ভাঙ্গিতেছেন, সভ্যতা ভাঙ্গিতেছেন, শাসনতন্ত্র ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন কিন্তু এই বিদ্রোহীর গড়িবার ক্ষমতাকে কে অস্বীকার করিবে। চৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের প্লাবন যখন বাংলায় আসিয়াছিল, তখন অনেক জগাই মাধাই মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আর এই মহাত্মার সংস্পর্শে অনেক লোহা সোণা হইল, অনেক জগাই মাধাই মুক্তি পাইল। তাঁহার পবিত্র দৃষ্টির সম্মুখে পাপের অবস্থান অসম্ভব, তাই যাঁহার দিকে হাসিয়া চাহেন তাঁহার অন্তরের সব কলঙ্ক কালিমা কাটিয়া যায়। হিন্দু এবং মুসলমান, ধনী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র সকলেই ইহার কাছে সমান ব্যবহার পান। রাজসভায় যে ভাবে কথা কহেন, তোমার আমার মত লোকের সহিতও সেই ভাবে কথা কন। মানুষের প্রতি এমন প্রাণ-ভরা ভালবাসা ভারতে আগে হয়ত লোকে দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু বর্ত্তমানে বিশ্বে এর তুলনা পাওয়া যায় না। সত্যের জন্য কুমারীতনয় যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালেও বলিয়াছিলেন "পিতা ক্ষমা কর আমার ভাইদের"। আজ বিংশ শতাব্দীতে ভারতে সেই বাণীই বিশ্ববাসী শুনিতে পাইবে।

আমরা মহাত্মার সকল মতকে, সকল কাজকে না স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু মহাত্মার ত্যাগ, মহাত্মার তপস্যা, মহাত্মার সত্যে আলৌকিক বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা দেখাইতে যেন না ভুলি। যেখানে শুধু কথা বেচিয়া দেশের কাজ চলিতেছিল, যেখানে শুধু হিন্দুর

দেশ শুধু মুসলমানের দেশ, হিন্দুজাতীয়তা, মুসলমানজাতীয়তা প্রভৃতির প্রচার ও প্রসার চলিতেছিল, সেই স্থানে শুধু হিন্দুর নয় শুধু মুসলমানের নয় ভারতে জাতীয়তার প্রচারক ও প্রবর্ত্তক আমরা পাইয়াছি। যেখানে দূর হইতে জনসেবা করিয়া জননায়কগণ করতালিধ্বনি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেখানে জনসমাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রেমে প্রাণে এক হইয়া যে মহাপুরুষ স্বরাজ্য লাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করি, তাঁহার কার্য্য সার্থক হউক ভগবানের কাছে এ প্রার্থনা করি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস।

মৌলানা মহম্মদআলি

সংসারে সুখে থাকিতে পারিলেই অনেকে কৃতার্থ ও জীবন ধন্য হইল ভাবে—এবং সুখ ছাড়িয়া সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, স্বাধীনতার জন্য যে গৌরবময় দুঃখ ও যন্ত্রনা তাহা ভোগ করিতে চায় না। তাহাদের কাছে কোন রকমে খাইয়া পরিয়া শুইয়া বসিয়া, দশ আনা ছয় আনা হিসাব করিয়া, সংসারের দিনগুলি কাটাইয়া দেওয়াই পরম সার্থকতা। দুনিয়াতে কিন্তু এমন বুদ্ধিমান সকলেই নহে—তাই নানা বিদপকে ডাকিয়া, নানা বাধাকে অতিক্রম করিয়া একদল লোক সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য—স্বাধীনতা লাভের জন্য—জীবনযৌবন বিদ্যাবুদ্ধি সুখসৌভাগ্য সমস্তই হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া তবে প্রাণে শান্তি লাভ করেন। এই সকল লোকের কাছে মানুষের কথা, মানুষের সোজাপথ ও সোজাবুদ্ধি তেমন বেশি কাজ করে না যেমন ভগবানের উক্তি ধর্ম্ম শাস্ত্রের কথা। মৌলানা মহম্মদআলি এক জায়গায় এক পত্রে লিখিয়াছেন "আমরা সকলের চেয়ে বেশী মানি ভগবানকে—ভগবানের কোরাণোক্ত বচনকে এবং আমাদের ধর্ম্মগুরু মহম্মদকে।"

এই গুটিকয়েক কথাতেই বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারাযায় যে লোকটি—বাস্তব হইতে অবাস্তবের, সুবিধা হইতে সত্যের এবং ইহকাল হইতে পরকালের প্রতিই বেশি শ্রদ্ধাবান। সত্যকে শুধু মুখে মানিলে এবং মহাপুরুষকে শুধু মুখে শ্রদ্ধা দেখাইলে

মহম্মদ আলিকে কোন কষ্ট, কোন যন্ত্রনা, কোন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না—কিন্তু তিনি যখনই কথা ও কাজকে একেবারে ঠিক ভাবে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই বর্ত্তমান বিশ্বনীতিতে তাঁহার ললাটে যে সব ভোগ ঘটিয়াছে তাহা দূর করা সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আজ তাঁহাকে যে জনসমাজ শ্রদ্ধা করিতেছে, তাঁহার বাক্যে ইহকালের সুখ সুবিধা ত্যাগ করিয়া প্রাণ দিতে চাহিতেছে, তার প্রধান কারণ তিনি বাক্যে ও কর্ম্মে অদ্ভুত সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন এবং মৃত্যু সহিতে হইলেও যে মিথ্যা বলিতে পারেন না জীবনে দেখাইয়াছেন।

গান্ধীর জীবনকথায় দেখা গিয়াছে, তিনি সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য কত না সংগ্রাম করিয়াছেন, কত না ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যায়কে অন্যায় বলিতে গান্ধী যেমন কোন ভয় খান নাই, তেমনি আজ গান্ধীর প্রিয়তম সহকর্ম্মী মৌলানা মহম্মদআলি তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের জন্য, সত্যভাষনের জন্য স্বাধীন চিন্তা ও রচনার জন্য কারা-যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছেন, তবু সত্যপথ ত্যাগ করিতে চাহেন নাই।

মহম্মদআলির পিতৃপুরুষগণ মোরাদাবাদের প্রাচীন বাসিন্দা। তাঁহার পিতামহ খাঁ ইসমন্‌আলি বকস্‌ খাঁ রামপুর নবাব সরকারে বেশ ভাল চাকরি করিতেন। যখন সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজ-রাজের রাজ্য শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, যখন নাইনিতালে ইংরাজ বিদ্রোহীসিপাহীদিগের দ্বারা বিপর্য্যস্ত ও বিপন্ন, তখন খাঁ ইসমন রামপুর নবাবের পক্ষ হইতে অনেক সাহায্য করিয়া অনেক বুদ্ধি করিয়া ইংরাজদিগকে বাঁচান। ইংরাজ সরকার রামপুর নবাবের ঋণ শোধ করিবার জন্য বিদ্রোহ অন্তে অনেক স্থান

নবাব বাহাদুরকে উপহার দেন এবং খাঁ ইসমনকে সেই সময় জায়গীর দেওয়া হয়। রামপুর নবাবও তাঁহাকে অনেক ধনরত্নে কার্য্যের পুরস্কার দেন। নবাব কালবইআলি খাঁ বাহাদুর —খাঁ ইসমনের বংশধর। তিনি রাজসরকারে ও সাধারণ লোকের কাছে বেশ শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহম্মদআলির খুল্লতাতদ্বয় রামপুর নবাবের সমরবিভাগে বড় বড় চাকরি করেন। মহম্মদআলির পিতা আবদুলআলি খাঁ ছিলেন নবাবের সমরবাহিনীর বড় কাজে। তাঁর সঙ্গে যাঁহারা কাজ করিতেন সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। আজ পর্য্যন্ত এই পরিবারের সহিত নবাবদিগের যোগ রহিয়াছে এবং এই ভক্ত মুসলমান পরিবার আজও প্রভুর কাজে সদা সর্ব্বদা সর্ব্বস্বদানে প্রস্তুত।

মোটে তেত্রিশ বৎসর বয়সে ছয়টি পুত্র কন্যা রাখিয়া, মহম্মদ. আলির পিতা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করিয়া যান। বিধবা মহম্মদ আলির জননীকেই ছেলেদের ভার লইতে হইল। মহম্মদ-আলির বয়স তখন দুই বৎসর, আর সওকাৎ আলি সাত বৎসরের শিশু। জননীর হাতেই সন্তান গুলিকে মানুষ করিবার ভার পড়িল। মহম্মদ-জননীকে প্রথমেই সন্তানগণের শিক্ষার কথা ভাবিতে হইল। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। স্যার সৈয়দ আহামদ খাঁ মুসলমানদের মন হইতে ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে যে কুসংস্কার ছিল তাহা দূর করিবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিয়াছিলেন। মহম্মদ-জননী কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে

পারিলেন, যে ছেলেদের ইংরাজি শিক্ষা না দিলে কিছুতেই তাহারা বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত হইতে পারিবে না। তিনি সন্তানদের ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আলিগড় কলেজে মহম্মদ আলি ও সওকৎ আলি পড়িতে লাগিলেন। কেবল কলেজে ছেলেদের ভর্ত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই—তিনি নিজে আলিগড় যাইতেন। সন্তানদের উপদেশ ও শিক্ষকদের সন্তানদের প্রতি কেমন ভাবে নজর রাখিতে হইবে, কেমন ভাবে পড়াইলে পড়া ভাল হইবে ইত্যাদি কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিতেন। আলিগড় কলেজে সওকৎ আলি ও মহম্মদ আলি বেশ আমোদ আহ্লাদে পড়াশুনা ও খেলা করিতে লাগিলেন। কলেজে পড়িবার সময়ই মহম্মদ আলির আশ্চর্য্য স্মৃতি ও মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া রামপুর সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে আই, সি, এস, পড়াইবার জন্য বিলাত পাঠাইলেন। মহম্মদ আলি সাহিত্য চর্চ্চার জন্য অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে চাহিলেন। তিনি লিনকন কলেজে চারিবৎসর অধ্যয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মহম্মদ আলির সুন্দর ব্যবহার, আশ্চার্য্য ক্ষমতায় অনেকেই তাঁহাকে বন্ধুভাবে পাইতে ইচ্ছা করিত। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় মহম্মদ আলির পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই এবং এই কারণেই আই, সি, এস পরীক্ষায় 'পাশ' করিতে পারিলেন না। তিনি ইংরাজি ১৯০২—ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন এবং রামপুর শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম পদে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর তাঁহাকে আবার বি,এ, পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যাইতে

হয়। এলাহাবাদে হাইকোর্টে উকিল হইবার জন্য পরীক্ষা দিয়া তিনি উত্তীর্ণ হইতে না পারায় বরোদা রাজ সরকারে চাকরি গ্রহণ করিলেন। বরোদারাজ্যে বেশ প্রশংসার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। দরিদ্র প্রজাদের উপর জমির খাজনা ইত্যাদির জন্য অনেক অত্যাচার হইত, তিনি তাহা দূর করেন। মহারাজা মহম্মদআলিকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসিতেন। মহম্মদআলি নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতবাসী সুযোগ ও সুবিধা পাইলে যে কোনও কাজ সুন্দর ভাবে করিতে পারে। আফিসের কাজে মন বসিল না, দেশের কাজে, জাতি ও ধর্ম্মের কাজের জন্য মন কাঁদিল, কাজেই তিনি দুই বৎসরের ছুটি লইয়া কলিকাতা হইতে 'কমরেড' কাগজ বাহির করিবেন ঠিক করিলেন।

বরোদায় থাকিতে ভারতের বর্ত্তমান অশান্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি জনসমাজে বেশ নাম করিয়াছিলেন। কাগজের ইংরাজ সম্পাদক হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের ইংরাজ ও এদেশী অনেক শিক্ষিত লোকেই লেখাগুলিকে বেশ ভাল বলিয়াছিলেন। তিনি "বর্ত্তমান ভারতের অশান্তি" নাম দিয়া যে পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন, তাহা সুধী সমাজে আসন লাভ করিয়াছিল। তিনি নানা পত্রিকায় প্রবন্ধাদি পাঠাইতেন, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা "অতীত ও বর্ত্তমান ভারত।" এই পুস্তকের রচনাগুলি ধারাবাহিক ভাবে "হিন্দুস্থান রিভিউ" মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তাঁহার রচনায় ভাষার যেমন স্বচ্ছন্দ গতি, ভাবের তেমনি অপূর্ব্ব গভীরতা, এবং প্রাণের তেমনি আশ্চর্য্য প্রকাশ সকলেরই চোখে ঠেকিবে।

মহম্মদআলিকে এই সময় জোয়ার নবাব বাহাদুরের প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য স্যর মাইকেল ওডায়ার বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু সংবাদ পত্র বাহির করিতে কৃতসংকল্প মহম্মদ আলিকে তিনি ফিরাইতে পারিলেন না। মহম্মদআলি কলিকাতায় আসিলেন।

দুই বৎসরের ছুটি লইয়া কলিকাতা হইতে ১লা জানুয়ারি ইংরাজি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদআলি 'কমরেড' কাগজ বাহির করিলেন। এক সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কিসের জন্য কাজ ছাড়িয়া কাগজ বাহির করিতে গেলেন, তিনি উত্তরে বলেন, "সমাজ আমার কাজ চায়, সমাজের কাগজ চাই তাই আমি কাগজ বার করেছি।" কাগজ খানির প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা কাহারও দলের লোক নহি—সকলেরই সঙ্গী। আমরা ভারতে জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ দেখিতে পাইতেছি কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে। ভারতের বিভিন্ন দলের ও মতের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাজায় প্রজায় যে পার্থক্য দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীর গড়িয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেই সমালোচনা শেষ হইবে। দেশের লোক ও সরকার উভয়েই কর্ত্তব্য করিলে, দায়িত্বজ্ঞান রাখিলে পরস্পর পরস্পরকে হাত ধরিয়া সাহায্য করিয়া সুবিচার ও সুনিয়মের দিকেই লইয়া যাইবে"। মহম্মদআলি হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যকে যেখানে পারিয়াছেন বাধা দিয়াছেন, নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাতৃভূমির মঙ্গল চিন্তা মহম্মদআলীর হৃদয়ে আবাল্য বিরাজ

করিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন "আজকের কথা ভাবিবার সময় কাল কি হইবে সে ভাবনা ভুলিলে চলিবে না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, যদি হিন্দু বা মুসলমান একজন অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আজ কোনখানে লাভ করে, একজন অপরের সাহায্য না লইয়া কোন সঞ্চয় করে-সে লাভ টিকিবে না, সে সঞ্চয় একেবারেই নষ্ট হইবে। প্রত্যেক কাজই করিতে হইবে খুব সতর্কতার সঙ্গে। য়ুরোপের মানবপ্রেমিক ও রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ—জাতীয় হিংসা দ্বেষ মূলক যুদ্ধ ইত্যাদি য়ুরোপে নিত্য ঘটিলেও যুদ্ধের অবসান হইবে একথা বলিতে নিরস্ত হন না, তখন আমরাই বা কেন হিন্দু মুসলমান মিলিবে এবং ভারতের একই জাতীয়ভাব উভয়কে বাঁধিবে একথা বলিব না! আজই হয়ত আমরা জাপানের মতন স্বদেশপ্রেম না জাগাইতে পারি, কিন্তু কেনেডার মত আমরা যে একদিন স্বাধীন হইব না কে বলিল? আমাদের প্রেমের বিবাহ না হইতে পারে —কবিতা ও রূপকথায় যার বাস্তবিক জন্ম। কিন্তু চুক্তিপত্রে সই করিয়া সামাজিক রীতিকে রক্ষা করিয়া যে বিবাহ হয় তাকে তুচ্ছ করিব কি বলিয়া? আজ যদি গদ্যেই আমরা কাজ আরম্ভ করি কবিতাদেবী সে অর্ঘ্য অগ্রাহ্য করিবে না। এস আমরা সকলে মিলিয়া ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলি।" কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লিগের মিলন হইবার বহু পূর্ব্বেই—মহম্মদআলি হিন্দু মুসলমান-দিগের মিলন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মহম্মদআলির কাগজ সরকার ও সাহেবমহলে প্রথমটা বেশই আদর লাভ করিয়াছিল—কিন্তু শেষকালে যখন কঠিন সত্য ধীরে ধীরে সরকার বাহাদুরকে শুনাইবার জন্য কাগজে তাহার লেখা বাহির হইতে লাগিল তখন

আর সরকারি প্রেম থাকিল না। হিন্দুর দাবি যেখানে মুসলমান-দের প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য রাখিতেও ভুলিয়া যাইত, সেখানে মহম্মদআলি মুসলমানদের পক্ষ হইতে বেশ সরল সত্য কথায় হিন্দুদের কর্ত্তব্যত্রুটি দেখাইয়া দিতেন। দিল্লীতে রাজধানী উঠিয়া গেল, কাগজখানিও দিল্লী হইতে বাহির হইতে লাগিল। মহম্মদআলি কাগজে এবং মোসলেমলিগে বক্তৃতায় ভারতের স্বায়ত্বশাসন লাভই যে একমাত্র প্রয়োজন, একথা লিখিতে ও বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতে ইংরাজি জানে ও বুঝে খুবই অল্পলোক। মহম্মদআলি ইংরাজি কাগজ বাহির করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে দেশের জনসমাজে তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে দেশী ভাষায় পত্রিকা বাহির করিতে হইবে, নতুবা শুধু ইংরাজি রচনায় কোন কাজ হইতে পারে না। ইংরাজি ১৯১৩—তিনি উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকা "হাম্‌দরদ" বাহির করিলেন। একটি সম্পাদক সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহাদের হাতেই কাজের ভার দিলেন—নিজে কেবল সম্পাদকদিগকে মাঝে মাঝে উপদেশ ও সাহায্য দানে উৎসাহ দিতেন। কেবলমাত্র কাগজ বাহির করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না—উর্দ্দু ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা বাহির করাইবার জন্য লেখক রাখিলেন এবং তাহাদের দ্বারা ভাল ভাল বই লেখাইয়া জনসমাজে সামান্য দামে বিতরণ করিতে লাগিলেন। যেমন ইংরাজি ভাষায় তেমনি উর্দ্দু ভাষায় তাঁর লিখিবার শক্তি অসাধারণ—তাঁর ভাষা সরল ও স্বচ্ছ, ও শক্তিমান। কাগজখানির দাম ছিল দুই পয়সা—গ্রাহক ছিল

নয় হাজার। ভারতসরকার মহম্মদআলিকে অন্তরীন করিবার পরও কাগজখানি নিয়মিত ভাবে অনেক দিন বাহির হইয়াছিল,—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাগজখানি সরকারবাহাদুরের মতে অশান্তি ও রাজদ্রোহের প্রচার করিতেছিল, সুতরাং কাগজ-খানি বাহির করা বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইল। যদি কোনদিন মুসলমান জনসমাজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও শক্তির পরিচয় দেয়, যদি কোনদিন পঙ্গু জনসাধারণ উঠিয়া দাঁড়ায় এবং নির্ভয়ে সর্ব্বশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, তবে সেদিন বুঝিতে পারা যাইবে মহম্মদআলির উর্দ্দূ দৈনিক দেশের কি মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

আজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় শিক্ষার যে চেষ্টা চলিতেছে, যে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে, মহম্মদআলি বহুবর্ষ পূর্ব্বে সে কাজের জন্য চেষ্টা ও চিন্তা করিয়াছিলেন। আজকে তিনি কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীর কথা শুনিয়াই যে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছেন, তাহা নহে। মুসলমানের ধর্ম্ম ও জাতীয় বৈশিষ্টকে বজায় রাখিয়া, মুসলমানের অতীত সভ্যতা ও সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বর্ত্তমানের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য অনেক ভাবুক মুসলমানই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উদ্যোগী হন ; কিন্তু মহম্মদআলিই প্রথমে এই কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করিয়া মুসলমানদিগের নিকট হইতে সাহায্য চান। এই কাজে তিনি অনেক টাকা তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নিখিল ভারতবর্ষীয় মুসলমান শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত

করিয়া ভারতের মুসলমানগণকে শিক্ষা দিবেন। আজ মুসলমান-দের জন্য আলিগড়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু মহম্মদ-আলি মুসলমানদের জন্য যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় চাহিয়াছিলেন ইহা তেমন হয় নাই। সরকার বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে মুসলমানদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়টি চালাইতে হইবে। মহম্মদআলির ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতে যে শিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে এবং যে শিক্ষা সরকার বাহাদুর দেশবাসীকে দিতেছেন, ইহার মূলে নীচ কর্ম্মাভিসন্ধি রহিয়াছে। সরকার চান চাকর, শিক্ষা দেন যাহাতে আমরা চাকর হইতে পারি। ইহা আমাদের সম্মুখে কোন মহৎ আদর্শ রাখে নাই, ইহার ফলে ইহা জনসমাজের চিত্তে গভীরভাবে আশ্রয় লাভ করে নাই। জনশিক্ষা কখনই সরকারের ইচ্ছা, খেয়াল, ও আদেশ মাথায় রাখিয়া হইতেই পারে না। সরকারি শিক্ষায় চালাক ও ধূর্ত্তলোক গড়িতে পারে, কিন্তু মানুষের মতন মানুষ এ শিক্ষার দ্বারা হইতেই পারে না। এ শিক্ষার ফলে বড় বড় ব্যবসাদার গড়া যাইতে পারে, কিন্তু এ শিক্ষা কোনমতেই সেই সব মানুষ গড়িতে পারে না যাদের হৃদয়ে আছে বিরাট ভাব, চিন্তায় অসীম দুঃসাহসিকতা এবং যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা চিন্তার দ্বারা জাতীয় জীবনকে জাতীয় তপস্যাকে সিদ্ধি দান করিবেন। কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষাই এ কাজ করিতে পারে। জাতীয় শিক্ষা সরকার বাহাদুর দিতে পারে না, সরকার বাহাদুরকে দিতে হইবে প্রাথমিক শিক্ষা যে শিক্ষা না হইলে দেশের কোন কাজই হইতে পারে না। সরকার বাহাদুর যতদিন না এ কাজ করিতেছেন ততদিন ধর্ম্মের নিকট সরকার সর্ব্বতোভাবে দায়ী। উচ্চ শিক্ষা

সম্পূর্ণ দেশবাসীর হাতে থাকা একান্ত আবশ্যক, ইহা চালাইবে দেশের লোক, ইহার কর্ত্তৃত্ব ভারও থাকিবে দেশের লোকের উপর। এ কাজ করিবার জন্য দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। সরকার কোনমতেই দেশের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না, সরকারের স্কুল কলেজ যতই ভাল হউক না কেন তাহাতে জাতীয় চরিত্র গঠিত ও জাতীয় প্রাণ মূর্ত্তি লাভ করিতেই পারে না। কেবল মাত্র হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ই এ কাজ করিতে পারে, জাতীয়তার বীজ বপন করিতে পারে। যদি ভারতকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিতে হয় তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষা আমাদের হাতে লইতেই হইবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এ কথা মহম্মদআলির আজ নূতন শিক্ষা নহে, নূতন প্রস্তাব নহে।

অনেকে ভাবেন, মহম্মদআলি শুধু মুসলমানদিগের জন্য এদেশে কাজ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—একথা অবিশ্বাস্য এবং অশ্রদ্ধেয়। তিনি সকল দেশের সকল জাতির মুসলমানকেই ভাই মনে করেন সত্য—কিন্তু তিনি একথা বেশ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ধর্ম্ম ভ্রাতৃত্ব জাতীয়তাকে কোনস্থানেই খর্ব্ব করিতে পারে না। তিনি মুসলমান হিসাবে সর্ব্বদেশের মুসলমানকেই ভাই মনে করেন। মুসলমান "ধর্ম্ম-ভাই" হিসাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মুসলমানকে দেখিলে কোথাও দেশদ্রোহী হয় নাই। চীনে মুসলমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহারাও চৈনিক স্বদেশিকতাকে ত্যাগ করে নাই, নষ্টও করে নাই। রুশে মুসলমান আছে, কিন্তু তাহারাও রুশের স্বদেশিকতা

ত্যাগ করে নাই। য়ুরোপের একদল স্বার্থপর রাষ্ট্রবিদ লোকে মুসলমান শক্তিকে বিশ্বে হেয় ও খর্ব্ব করিবার জন্যই মুসলমানের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছেন। মহম্মদআলি যুদ্ধের সময় বলিয়াছিলেন "তুরস্ক আমার 'ধর্ম্ম-ভাই', কিন্তু তাই বলিয়া যদি তুরস্কের সৈন্য ভারত সীমান্তে আজ আক্রমণ করিতে আসে, আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিব, তুরস্কের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব।"

মহম্মদআলী মুসলমান ধর্ম্মে গভীর আস্থাবান হইলেও, ভারতের হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া যে জাতীয় সত্বা বজায় রাখিতে হইবে, একথা তিনি একদিনের জন্যও ভুলেন নাই। তিনি হিন্দুকে তার উদার হিন্দুত্বের দিকে দাঁড়াইয়া ও মুসলমানকে তার উদার মুসলমান ধর্ম্মের দিকে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে একথা বার বার বলিয়াছেন।

কাণপুরে মুসলমানদিগের মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাস্তা করিবার জন্য মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ মৌলবিদের মত লইলেন। এই প্রস্তাব যখন মুসলমানদের কর্ণগোচর হইল, তখন ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ইহার প্রতিবাদ হইতে লাগিল। সরকার বাহাদুর মুসলমান দিগের মতকে উপেক্ষা করিয়া পুলিশ পাহারা নিযুক্ত করিয়া মসজিদের কিয়দংশ ভাঙ্গিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের সভা হইতে লাগিল—ভারতের দেশীয় কাগজ গুলিতে মুসলমানের ধর্ম্মে সরকার হাত দিয়াছেন একথা প্রচার পাইতে লাগিল। এক্ষেত্রে হিন্দুরাও মুসলমানদিগের পক্ষ

লইতে ভুলিলেন না। একসঙ্গে হিন্দু মুসলমান এক হইয়া এই সর্ব্ব প্রথম সরকারের কাজে ভারতব্যাপী প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ৩রা অক্টোবর ১৯১৩—কানপুরের মুসলমান জনসঙ্ঘ ইট পাথর ইত্যাদি সাজাইয়া তাহাদের ভাঙ্গা মসজিদ গড়িতে লাগিল—ইহাতে সরকার আসন্ন অশান্তি ও বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখিতে পাইলেন এবং জনসঙ্ঘকে সরাইবার জন্য পুলিশ ফৌজ পাঠাইলেন। পুলিশ গুলি চালাইয়া বন্দুকের বর্শায় অস্ত্রহীন প্রজাকে অল্প সময়ের মধ্যে শান্ত করিল। কত যে মরিয়াছিল তাহা ঠিক জানা নাই, তবে মৃত্যু ও শাস্তি অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। মহম্মদআলি বিলাতে যাত্রা করিলেন—সেখানে জনসাধারণকে মুসলমানের ধর্ম্মে হাত দিয়া, মুসলমানকে ভারতে কেমন ভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহা তিনি বলিতে ছাড়িলেন না। তাঁহার কাজের ফল ফলিল, ভারতের উদার বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেব মসজিদ গড়িয়া দিলেন—মুসলমানকে শান্ত করিলেন ন্যায় ও শান্তিকে যথার্থ ভাবে রক্ষা করিলেন। মহম্মদআলি বিলাত হইতে ভারতে ফিরিলেন এবং হার্ডিঞ্জ সাহেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

বল্‌কান যুদ্ধ বাধিল—তুরস্ককে সাহায্য করিতে হইবে। তুরস্ক ভারতের মুসলমান দিগের 'খালিফ'—ধর্ম্মগুরু। ধর্ম্মের জন্য আলি সাহেব চিরদিনই গভীর ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তুরস্ককে সাহায্য করিবার জন্য রণক্ষেত্রে সেবক-বাহিনী পাঠাইলেন। ১৯১২—ভারতীয় সেবক-সঙ্ঘ যাত্রা করে, তাহাদের দ্বারা তুরস্কের সাহায্য যথেষ্টই হইয়াছিল। এই কাজের জন্য ডাঃ আনসারি ও

মহম্মদআলি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন—কেননা টাকা ও লোক সংগ্রহ সমস্তই তাঁহাদের করিতে হইয়াছিল। য়ুরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রত্যাগত সেবকবাহিনী ভারত সরকারের কার্য্যে যোগদান করে।

দিল্লীতে কসাই ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল—মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের নিয়মকানুন তাদের কাজে নানা বাধা দিত, তারই প্রতিকার চাহিয়া বসিল। মহম্মদআলিকে তাহারা মধ্যস্থ মানিলে তিনি সব মিটমাট করিয়া দেন। মহম্মদআলির কথা মুসলমান সাধারণ কেমন ভাবে মানে, সেইদিন মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিয়াছিলেন।

সেকালের মুসলমান নেতারা ছিলেন 'হুজুরালি' থাই বেশি—অর্থাৎ সাহেব সুবাদের নেকনজরে পড়িবার চেষ্টা ছিল তাদের প্রাণে অত্যন্ত প্রবল। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হাত জোড় ও মাথা হেঁট করা অভ্যাস তাঁহাদের কাছে একরকম স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। কাজেই হুজুরালির দল মহম্মদআলিকে প্রথম প্রথম লোকের কাছে ও সরকার বাহাদুরের কাছে ছোট করিবার চেষ্টা খুবই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে মুসলমানদের নেতা ছিলেন তাঁরাই—কাজেই মুসলমানদেরও অনেকটা সরকারের সব কাজেও সব কথায় 'হাঁ' দেওয়া অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের খুব একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হউক, এ ইচ্ছা একশ্রেণীর শাসনকর্ত্তার মনে বড় খারাপ বলিয়াই ঠেকে এবং ইংরাজ বণিকদের অসুবিধা খুবই বেশি হয় যদি এই দুই ভায়ে ঝগড়া না থাকে। সুচতুর শাসনকর্ত্তারা হিন্দুমুসলমানের বিবাদই মনে করেন বৃটিশ শাসনের

একটি বড় বনিয়াদ্, কাজেই এটা থাকাই তাঁদের ইচ্ছা, মুখে না বলিলেও অন্তরে এ ভাব পোষণ করেন। প্রাজ্ঞ মহম্মদআলি শাদা সোজা মতলব বেশ সহজেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরে মিলিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি নিজে হিন্দু কলেজে গিয়া কাশীতে হিন্দুছাত্র মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"সঙ্কীর্ণ সামাজিক মতকে দূরে রাখিয়া, হিন্দুমুসলমানের মূলগত পার্থক্যকে বজায় রাখিয়া, পরস্পরের মধ্যে মিলন আনিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানকে একই স্বাদেশিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে হইবে।"

য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিল—মহম্মদ আলি তুরস্ককে চিরদিন অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করেন, কাজেই তাঁর অন্তরে আশঙ্কা জাগিল পাছে তুরস্ক ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। তিনি তুরস্ককে যুদ্ধে যোগ না দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন, কিন্তু তুরস্ক ইংরাজের বিরুদ্ধে যোগদান করিল। মহম্মদ আলি তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলেন না—তবে তিনি ইংরাজের শত্রুতা কোন রকমেই করেন নাই। ইংলণ্ডের টাইমস্ কাগজে তুরস্ককে অপমান করিয়া একটি জঘন্য জাতি-বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ বাহির হইল। মহম্মদ আলিও তুরস্কের যুদ্ধে যোগদান করিবার ঠিক চারদিন আগে, সেই প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করিলেন। ১৯১৪—তাঁর প্রবন্ধ বাহির হইবার ঠিক একমাস পরেই সরকার বাহাদুর তাঁর কাগজের জন্য জমা ২০০০ টাকা এবং তার ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'কমরেড'

কাগজ বাজয়াপ্ত করিলেন। মহম্মদআলির প্রবন্ধে সত্য কথা ছাড়া মিথ্যা বা অন্যায় কিছুই ছিল না, একথা ভারতবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব বলিলেও ভারত-সরকার তাঁর প্রবন্ধে রাজদ্রোহের গন্ধ পাইয়াছিলেন। তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া গেল, এইবার তাঁর নিজের পালা আসিল। ভারত সরকার তাঁহাকে মে মাসে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অন্তরীণে পাঠাইলেন; তিনি বেশ হাস্যমুখে সাজা গ্রহণ করিলেন কিন্তু ভারতবাসী নীরবে নেতার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিল না—তাহারা নানা স্থানে সভা সমিতি করিয়া সরকারের কাজের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। যখন মহম্মদ-আলি ও তাঁহার ভ্রাতা দিল্লীর জুম্মা মসজিদে প্রার্থনা শেষ করিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া সরকারের আদেশে অন্তরীণে যান তখন সকলেরই চোখে জল দেখা গিয়াছিল। মহম্মদআলি সকলের নিকট বিনীতভাবে বলিয়া যান, "উপদ্রব করিয়া শান্তিভঙ্গ করিয়া তাহারা যেন তাঁহাকে লজ্জিত না করেন।"

সরকার বাহাদুর অন্তরীণের কোন ন্যায়সঙ্গত সঠিক কারণ দেখাইতে পারেন নাই। সরকার বলিতে পারেন নাই কোন্ অপরাধে ভারতের এই দুইটি প্রকৃত স্বদেশসেবককে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বিনা বিচারে মহম্মদআলিকে ধরা এবং জেলের কয়েদীর মতন না রাখিলেও, স্বাধীনতা হরণ করায় সরকার বাহাদুরের কোন গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই বরং লোকের মনে যেটুকু বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মজরুলহক, মহম্মদজিন্না প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ লাট-দরবারে মহম্মদআলিকে যাহাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, অথবা

তাঁহার প্রতি ন্যায় বিচার হয়, সে বিষয়ে অনেক চেষ্ট করিয়া ছিলেন ; কিন্তু সরকার ধর্ম্মের কাহিনী শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিসেস বেশান্টকে যখন মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিল সেই সময়ে আলি ভ্রাতাদ্বয়কে ছাড়া হইবে কিন্তু আলিভ্রাতারা তখনও মুক্তি পান নাই। মহম্মদআলি ও সওকৎআলি যখন দেখিলেন সরকার তাঁহাদের কোন দোষ দেখাইতে পারিলেন না, অথচ অন্যায় ভাবে একস্থানে রাখিয়াছেন তখন তাঁহারা অন্তরীণের আইন অমান্য করিয়া জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান। যাহা হউক সরকার বাহাদুর যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মহম্মদআলি কারামুক্ত হইয়া দেখিলেন সন্ধিতে ইংরাজ—না হউক অন্যান্য জাতি তুরস্কের প্রতি অবিচার করিতে পারে। ভারত সরকার ও ইংরাজ মন্ত্রীগণ সমরান্তের সময় হইতে বলিয়া আসিতেছিলেন তুরস্কের প্রতি কোন অবিচার হইবে না। সেই কথা ভাল করিয়া ইংরাজ জাতিকে বুঝাইবার জন্য এবং ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রজার মনের ভাব জানাইবার জন্য-তিনি খলিফৎ কমিটি গঠিত করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, সত্য ও সাম্যের বড় বড় কথাও—আর বৃটিশ মন্ত্রীদের মুখে শোনা যায় না। মহম্মদআলি বিলাত গিয়া ভারতীয় খলিফৎ কমিটির মতামত ইংরাজ সাধারণের কাছে উপস্থিত করিলেন। ইংরাজ মন্ত্রীরা কথা ঠিক রাখিতে পারেন নাই—ভারত সরকার ও তুরস্কের প্রতি সুবিচার যাহাতে হয় সে চেষ্টা করিলেও কাজে কিছুই

করিতে পারেন নাই। তুরস্কের শক্তি খর্ব্ব করিয়া তুরস্কের অধিকার সঙ্কীর্ণ করিয়া, তবে য়ুরোপের রাজশক্তিরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। মহম্মদআলি ভারতের মুসলমানদিগের প্রতিনিধিরূপে য়ূরোপের অরণ্যে রোদন করিয়া দেশে ফিরিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন ভিক্ষার দ্বারা, প্রার্থনার দ্বারা জগতের কোন জাতি কোন অধিকার লাভ করে নাই। তিনি দেশে মুসলমান জনসাধারণকে শক্তিশালী করিবার জন্য নিজে ও তাঁহার দলের অন্যান্য নেতাদের লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বেই লাট দরবারে বলিয়াছিলেন ভারতের মুসলমান যাহাতে আঘাত পায় সে আঘাত হিন্দুর ও বুকে বাজে। কাজেই তিনিও মহম্মদআলির সহিত একই সঙ্গে ভারতের জনসাধারণকে স্বাধীনতার পথে মুসলমানদের সহিত যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। পাঞ্জাব ও খালিফৎ সমস্যাই ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানকে স্বরাজ্য বিনা কোন উপায় নাই একথা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। আজ সেইজন্য গান্ধীর অহিংসা অসহযোগ হিন্দু মুসলমান একই সঙ্গে গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। আর এই দুইটি বিরাট জনসঙ্ঘকে এক করিয়া পরিচালিত করিতেছেন গান্ধী ও মহম্মদআলি।

মহম্মদআলির চরিত্র অম্লান, হৃদয়ে তাঁর অতুল সাহস, বাহুতে অসীম শক্তি। আজ আমরা তাঁহার মতকে সম্পূর্ণভাবে সকলে গ্রহণ না করিতে পারি, আজ তাঁহার দুর্জ্জয় সাহসকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মশক্তিকে তাঁহার দুষ্কর তপস্যা ও ত্যাগকে কি বলিয়া অস্বীকার করিব? আমরা তাঁর

কণ্ঠে যে বীরবাণী শুনিতেছি তাহাকে কেমন করিয়া অসম্মান দেখাইব? তাঁহার আহ্বান আজ শুধু জনবহুল নগরে নহে শুধু ভারতের এক প্রদেশে নহে সুদূর পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। আমরা তাঁহারই ভক্তগণের সঙ্গে বলি—"হে বীর ধর্ম্মের জন্য, জাতীয়তার জন্য, দেশের জন্য তুমি যাহা করিতেছ তাহা সার্থক হউক, তোমার জয় হউক, ভারতের জয় হউক—হিন্দু মুসলমানের দেবতা বিধাতার জয় হউক"।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

এই পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে ক্ষণজন্মা দিব্য পুরুষগণ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্রকে অন্তরমধ্যে ধারণ করতঃ ইহাকে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম দীক্ষা মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন। বিধির বিচিত্র বিধানে এই স্মরণীয় মহাদেশে যুগে যুগে এই দীক্ষামন্ত্রের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্তই যেন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ প্রকৃত মাতৃভক্তকেই যথার্থ দেশভক্ত হইতে দেখা যায়। কেননা গৃহে যিনি জননীকে দেবতা জানিয়া তাহার সেবা৷ ত থাকেন, তিনিই গৃহের বাহিরে দেশমাতৃকায় সেই মাতৃ স্বরূপের বিকাশ দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়েন।

আজ আমরা যাঁহার জীবন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক যে দাসবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসী অনেকেরই সুপরিচিত। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাশ যদিও পুত্রকে কোন আর্থিক ধন সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান নাই, কিন্তু যে পরম ঐশ্বর্য্যে সন্তানের আত্মাকে ঐশ্বর্য্যবান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই অমূল্য সম্পদ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করা' ভাগ্যের কথা। এ ধনবৈভব যে "যতই করিবে দান তত যায় বেড়ে।" বিধি প্রসাদে পিতৃপুরুষগণের পুণ্য ফলেই এই কুলতিলক চিত্তরঞ্জনের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে সেই আরাধ্য দেবতাগণের দৃঢ়

কর্ত্তব্যপরায়ণতা, উচ্চদানশীলতা ও অলৌকিক নির্ভীকতার পূতধারা বহিয়া যাইতেছে। এবং সে ধারায় সঞ্জীবিত থাকিয়া আজ তিনি পরমানন্দে বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার জন্মদায়িণী দেবীস্বরূপিণী "নিস্তারিণীর" আদর্শ মাতৃত্বে বর্দ্ধিত হইয়া আজ তিনি এভাবে অন্তরে বাহিরে মা-গত প্রাণ হইয়া আছেন। শৈশবে তিনি যে মধুর "মা" "মা" ডাকে প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিতেন, আজ পরিণত বয়সে কালের চক্রে সে জন্মদাত্রীকে ইহসংসার হইতে বিদায় দিয়াও সম্পদে বিপদে, শোকে দুঃখে সকল সময়েই তিনি মায়ের জাগ্রত নব নব রূপ দর্শন করিয়া এক অপূর্ব্ব মাতৃভাবে বিভোর হইয়া থাকেন; চক্ষে তখন তাঁর বিগলিত ধারা বহিয়া যায়। কি নির্জ্জনে, কি জনতার ভিতরে, তিনি কি চেতনে, কিবা বিচেতনে, তিনি তাঁর প্রাণময়ী মায়ের আবির্ভাব দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞানবিবর্জ্জিত, অসহায় শিশুর মত "মা" "মা" ডাকিয়া দেশমাতৃকাকে পরিতৃপ্ত করেন। সুজলা সুফলা নদী বহুলা এই সোণার বাঙলা তাঁর পরমারাধ্যা জননী। তাই ইহার দুঃখ দৈন্যে তিনি মর্ম্মাহত হন। প্রবল ঘূর্ণী-বাত্যায় যখন জল স্থল নভোমণ্ডল ওলটপালট করিয়া তাবৎ বাঙ্গালা দেশকে ত্রাসান্বিত করিয়াছিল, যখন দরিদ্রের অন্ন বস্ত্র গৃহের কোন সংস্থান ছিল না, তখন এই মহাপ্রাণে বড় ব্যথা বাজিয়া ছিল। আপন স্বাস্থ্যের জন্য অন্যত্র গিয়া তথায় সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। মর্ত্ত্যের ক্রন্দন সেই দূর দূর দেশে গিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা স্পর্শ করিল, অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহার প্রতিবিধানে তৎপর হইলেন। ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া, এমন কি আবশ্যক মত

ধনী-কৃপণের পদস্পর্শ করিয়া মায়ের সেবাদাসরূপে ব্যবহৃত হইলেন। এ কঠোর ব্রত সাধনায় শরীরের দৈহিক ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া দিনের পর দিন অসম্ভব অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা সুখবিলাসীদিগের কল্পনাতীত। কিন্তু এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, পল্লীতে পল্লীতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলের হিত বিধান করিয়া দেশবাসী সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। সে সময় তিনি সজল নয়নে বারংবার কেবল এই কথাই বলিতেন "মা আমার একি বেশে দেখা দিলেন?" প্রাণস্পর্শী বাণী শুনিয়া কেহ চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিত না।

তাই বলিতেছিলাম কাহার জীবন কি ভাবে গঠিত হইবে বাল্যকাল হইতেই তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

শৈশবে খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির উন্মেষ লক্ষিত হইল। একটু বেশী বয়সে বিদ্যারম্ভ করাই তাঁহার পিতামাতার অভিরুচি ছিল। কেননা কচি বয়সে পড়ার চাপ দিলে শিশুপ্রাণে অবাধগতিকে রুদ্ধ করার সম্ভাবনা থাকায় তাঁহারা পুত্রের সময় বুঝিয়া পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৮।৯ বৎসরের বালকের "হাতেখড়ি" হইলে পর সে জ্ঞানপথে খুব দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল দেখিয়া, জনক-জননীর এহেন রুচিতে বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হইল। তারপর চতুর্দ্দশ-বৎসর বয়ক্রম কালে জ্ঞানের পণ্যশালার দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এই কিশোর বয়সেই দশের কাছে দাঁড়াইয়া

কিছু বলিবার ইচ্ছা ইঁহাতে বলবতী দেখা যাইত। তখন মাঝে মাঝে আপন গৃহপ্রাঙ্গণে সমবয়স্ক আত্মীয়, প্রতিবেশীদিগকে দাঁড় করাইয়া যখন বালকমুখে বক্তৃতার ভঙ্গী করিয়া অনর্গল বলিয়া যাইত, আর মাঝে মাঝে তাহার শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন করতালি দিয়া সে তরুণ প্রাণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিত, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া কেহ যদিও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না, কিন্তু তাহার বলিবার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া পারিত না। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়মত জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে ক্রীত বস্তুজাতের সমুচিত মূল্য মজুত রাখিয়া, তথাকার প্রাথমিক ব্যবসায়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। তাহার এ কৃতিত্বে পরিতুষ্ট হইয়া পিতামাতা এই বিশ্ববিপণিতে সন্তানকে আরো কিছুকাল মুক্ত থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। সুবোধ সন্তান সে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যথাসময়ে সে বিপণির প্রথামত শিরস্ত্রান্ ধারণ করিয়া তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। বিদ্যোৎসাহী যুবকের মনস্থ ছিল একেবারে ইহার প্রভু হইয়া সসম্মানে ইহাতে আধিপত্য করিবেন, কিন্তু বিধির বিধান হইল অন্যরূপ। তাহার ডাক পড়িল সেই কালাপাণির ওপারে। সেদিনে, রাজ সরকারে গণ্যমান্য চাকরীতে বহাল হওয়াই বিদ্যার্জ্জনের চূড়ান্ত ফলাফল বিবেচিত হইত। তাহাতে এক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ বুৎপত্তি দেখিয়া ইঁহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন একযোগে ইহাকে রাজ সরকারে বিক্রীত হইতে পরামর্শ দিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া সেই স্বাধীনচেতা এ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। মনে দৃঢ় সংস্কার ছিল যে পুরুষানুক্রমে যখন জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত সরকার বাহাদুরের শরণাপন্ন হইতে হয় নাই, তখন এ

পুরুষে তার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা কম। তথাপি মনঃস্থির করিয়া সেই সুদূর প্রবাসে যাত্রা করিলেন এবং তথায় থাকিয়া যথাশক্তি কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। তাঁহার তথায় অবস্থানকালের দুই বৎসর পরে James Maclean নামক একজন M. P. ভারতের অধিবাসীদের প্রতি কতকগুলি গালিবর্ষণ করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। একুশ বৎসরের তেজস্বীযুবক স্বদেশের এই অসম্মানে উত্তেজিত হইয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য লণ্ডনস্থ ভারতবাসীদিগকে এক সভায় আহ্বান করেন। তাহাতে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। Londonএর Liberal partyর সভ্যগণ তখন আবার ইহাকে Oldhamএ তাঁহাদের সাবেক সভায় আহ্বান করেন। তখন "Indian Agitation" নামক বক্তৃতায় এই উদ্বুদ্ধ যুবক যে বাগ্মিতার ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সমস্ত ইংরেজমণ্ডলী স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া যায়। সেই বিস্তীর্ণ সভাগৃহে দাঁড়াইয়া যখন সেই নবীন বক্তা নির্ভীকচিত্তে গ্রীবা উচ্চ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"Gentlemen, I was sorry to find it given expression to in Parliamentary speeches on more than one occasion—that England conquered India by the sword and by the sword must she keep it! (*Shame*) England, Gentlemen! did no such thing. It was not her swords and bayonets that won for her this vast and glorious empire; it was not her military valour that achieved this triumph;

it was in the main a moral victory or moral trumph, (*cheers*). England might well be proud of it! But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of sword is the only policy that ought to be pursued in India, is to my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman. (*Hear, hear*).

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"We now find the base Anglo-Indian policy of oppression and tyrany; the policy of irritation and more irritation, of repression and more repression; the policy which has been beautifully described by one of its advocates as the policy of pure and unmitigated force."

এই সকল উক্তি শুনিয়া রাজপুরুষগণ যে চিত্তরঞ্জনকে তাহাদের মতে "Heaven born service" এ ভর্ত্তি করিতে পারেন না তাহা ত জানা কথা! সুতরাং তাঁহাকে এই পরীক্ষার্থীদের পাসের তালিকাভুক্ত দেখিয়াও নানা চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে এ সম্মানের কাজে নিযুক্ত করিলেন না। শিক্ষিত সভ্যজাত্যাভিমানীদের এই অন্যায় আচরণে তিনি বিন্দুমাত্রও মনঃক্ষুন্ন না হইয়া, বরং তাঁহার সংস্কার অনুযায়ী ফল দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন ইঁহার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল এবং পিতৃদেবেরও অর্থোপার্জ্জন হইতে অবসর লইবার সময় আসিয়াছে দেখিয়া, পিতৃবৎসল পুত্র তাঁহাকে সংসারের

সকল ভার হইতে অব্যাহতি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভগবৎ কৃপায় দিন দিনই বারিষ্টারীতে তিনি আশাতীত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদাশয় পিতা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও একমাত্র দয়ার পরবশ হইয়া পরের সাহায্য করিতে গিয়া, অসম্ভব ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি অন্যোপায় না দেখিয়া অবশেষে দেউলিয়া নাম লিখাইতে বাধ্য হন। পিতার এই পরিণত বয়সে পুত্রই পিতৃঋণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বিবেচনা করিয়া, চিত্তরঞ্জন পিতাকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; যদিচ আইনতঃ এ ঋণ পরিশোধ করার কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কিন্তু সত্যপরায়ণ চিত্তরঞ্জন এ চিন্তা মনেই স্থান দিতেন না। কয়েক বৎসর অনন্যমনে অক্লান্ত দেহে কার্য্য করিয়া আইন ব্যবসায়ে তাঁহার বিচক্ষণতা এবং সুদক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ফলে ক্রমে তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনকেই তিনি জীবনের সার বলিয়া মনে করিতেন না। কেননা তিনি সংসারের দাস হইয়াও অন্তরে বৈরাগী ছিলেন। তাঁহার যাহা কিছু উপার্জ্জন অধিকাংশই দানে ব্যয়িত হইত এবং ভবিষ্যৎ তিনি ভগবানের হাতে দিয়া নিশ্চিন্তে দিনযাপন করিতেন।

১৯০৯ সালে যখন বোমার মোকদ্দমায় বিপ্লববাদীদের পক্ষে ইহাকে নিযুক্ত করা হয়, তখন অর্থের প্রত্যাশা ছাড়িয়া তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল এ মামলা চালাইতে হইয়াছিল। তখন তাঁহার ধ্যান জ্ঞান কিসে তিনি দেশপূজ্য অরবিন্দকে ও অল্পমতি বালক-দিগকে মুক্তি দেওয়াইবেন। সে সময় কতজন তাঁহাকে

প্রাণের ভয় দেখাইয়া এ কার্য্য হইতে বিরত হইতে ইঙ্গিত করিয়াছে। কিন্তু নির্ভীকচেতা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কাছে প্রাণের ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। আট মাস কাল পরে যেদিন কলিকাতার বিচারালয়ে এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হয়, সেদিন তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের এক চিরস্মরণীয় দিন। বস্তুতঃ সেদিন হইতেই দেশ-বিদেশে তিনি সুপরিচিত হইয়া আছেন। সেই দিন হইতেই তিনি অর্থে মানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চা বাড়িতে লাগিল। বৈষ্ণব পদাবলী তখন তাঁহার প্রাণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। কঠোর ব্যবসাজীবী হইয়া তিনি কিরূপে সুললিত ছন্দ রচনা করেন! সংসারের ঘোর সংগ্রামে পড়িয়া তিনি কেমন করিয়া অন্তরের সরলতা রক্ষা করেন! অনেকের কাছে ইহা এক সমস্যা হইয়া পড়ে।

তাঁহার প্রেমোন্মুখী, ধর্ম্মোন্মুখী প্রাণ কখনই কেবল অর্থোন্মুখী হইয়া থাকিতে পারিত না। অর্থোপার্জ্জন তাঁহার জীবনের আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র ছিল। তাই একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হইয়াও তিনি কেবল তাহারই চর্চ্চায় দিন যাপন করিতে পারেন না। অবসর মত কি ইংরাজী কি বাঙ্গলা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাদি পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। এবং কখনও ধর্ম্মে কখনও বা প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহা সুলতিত ছন্দে গাঁথিয়া রাখিতেন। কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া ও তাঁহার সরল প্রাণ কখনও শুষ্ক হইয়া যায় নাই, তাই আজ এই পরিণত বয়সেও তিনি যুবার তাজা প্রাণের অধিকারী। তিনি একজন সুরসিক সাহিত্যিক বলিয়া

তাঁহার কি গদ্য কি পদ্য রচনাভঙ্গী অতিশয় মধুর ও চিত্তাকর্ষক! তাঁহার সুললিত কণ্ঠের গ্রন্থ পাঠ শুনিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। পড়িতে পড়িতে যখন তিনি তন্ময় হইয়া তাহাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া পড়েন, তখন সে পঠন শোনা বস্তুতঃই এক আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া পড়ে। তাই মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করিয়া সকলকে আনন্দিত করেন। তিনি যে একজন সুলেখক সুকবি তাহা দেশবাসীর অবিদিত নাই। তাঁহার "মালঞ্চ" তাঁহার "সাগর সঙ্গীত", "কিশোর কিশোরী", "অন্তর্য্যামী", তাঁহার "বাঙ্গালার কথা" "বাঙ্গলার গীতি কবিতা" কে পড়িয়া মুগ্ধ না হইয়াছে। মালঞ্চের তরুণ কবি সম্মুখে বিস্তৃত জীবনে বিবাগী হইয়া গাহিয়াছেন,—

"শুনেছি আহ্বান তব প্রাণপ্রিয় তুমি,
আমার অন্তর আজি উঠেছে কাঁপিয়া
ছিন্ন করি আশা পুষ্প জীবন অমিয়,
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া॥

বিভূতি মেখেছি দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার,
সুবর্ণ স্বপন সবি বিবর্ণ বিরাগ!
চরণে এনেছি মোর জীবন আধার
রাগে রাঙ্গা জবা সম রক্ত অনুরাগ!"

সাগরের সঙ্গলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেই স্বষ্টিকুশলীর স্বষ্টিনৈপুণ্যে মনুষ্য মাত্রেরই দুইটী চক্ষুর ভিতর দিয়া,

একই দৃশ্য বস্তুর বিভিন্ন ছাপ পড়ে, তাই ঐ শোন "সাগর সঙ্গীত" সাধক সিন্ধুরাজকে কি চক্ষে দেখিলেন !—

"হে ভকত ! হে সাধক ! করহ কীর্ত্তন নব !
সঙ্গে রেখো চিরকাল সাধনে ভজনে তব !
হরিবোল ! হরিবোল করতাল বাজে যেন
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন !
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ আজি কি মধু বিরহ দিয়া।
মায়াহীন ছায়া ভরা ধূসর এ অন্ধকারে
আপনার মাঝে তাই ডুবাইছ আপনারে।
আমিও আপন মাঝে আপনা লুকায়ে রাখি !
যবে যোগ ভেঙ্গে যাবে আমারে তুলিও ডাকি !
দীক্ষা দাও ওগো গুরু ! মন্ত্র দাও মোরে
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভরে !
হে পূজারি ! আজি তুমি কোন পূজাকর !
পরাণ প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলে ধর।"

হিমাদ্রির মহান্ নিস্তব্ধতার "অন্তর্য্যামীকে" পাইয়া স্তাবকের উক্তি—

"আজি শান্ত হিমগিরি, শান্ত তরুলতা !
প্রশান্ত গগনতলে তপন জ্বলিছে,
পরাণ মন্দিরে আজি মহা নীরবতা ;
হে নীরব ! হে মহান্ ! তোমারে বরিছে

পূর্ণ করি দাও আজি শান্ত এ হৃদয়,
হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরব নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ঐ তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে।"

তারপর তাঁর "কিশোর কিশোরী"—বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক অতি উচ্চ বিশ্লেষণ। ইহাতে তিনের কথা বুঝাইবার কবির প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। তিনি যে স্বভাবতঃ কৃষ্ণপ্রেমিক তাহা তাঁর "বাঙ্গলার গীতিকবিতা" পাঠেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সেখানে বলিয়াছেন :—

"এই বিশ্বসৃষ্টির রস মাধুর্য্য উপভোগই জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্বআত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব প্রাণের অন্তর ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলন-ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয়ের মহামিলনের রস তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, সেই প্রেমের দেবতা পরিপূর্ণ সবল, সহজ সরল সোহাগে ও আবেগে সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন। তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাহার। কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্য না পৌছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোঠর মণি না মিলাইতে পারে তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতি কবিতা সেই প্রাণের, সে অতল স্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তোলে।

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত, মুখরিত, বিকশিত

সৌন্দর্য্য লীলায় লীলায়িত। প্রকৃতি ও মানব উভয়ের ভিতরই বিশ্বাত্মার সমান খেলা। সাধনার পথে সাধক দেখে তাহার সম্মুখে এক নূতন জগৎ, এক বিরাট হৃদয়। সেই বিরাট হৃৎপিণ্ড এই বিরাট প্রাণ সমষ্টিকে বক্ষে লইয়া কালের ভিতর দিয়া অকালে ধাইতেছে। তখন তাহার মন সেই বিরাটের রূপের রসে মজিয়া এক অভিনব রূপান্তর সৃষ্টি করে। সেই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলনের অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া ওঠে।”

স্বদেশভক্ত প্রেমিক তাহার এই সকল গভীর গবেষণার মধ্যে যখন ভাবিতেন, এই অমর “গীতি কবিতার সৃষ্টি তাহার সোণার বাঙ্গলায় যেখানে পুণ্যশ্লোক কবিগণ গাহিয়াছেন :—

মেরেছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেবনা !

তখন বলিয়াছেন “এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মনপ্রাণ এক অদ্ভুত নবরসে উছলিয়া ওঠে, আঁখি তখন ছল ছল করে মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় জন্মেছি।” তাঁহার বাঙ্গলার গীতিকবিতায় যে এরূপ আরো কত কত প্রাণস্পর্শী কথা আছে, যাহারা এ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহারাই জানেন। দেশ-প্রাণ চিত্তরঞ্জন বাল্যকাল হইতে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও আপন প্রাণের প্রেরণায় বঙ্গসাহিত্য মন্দিরে-মায়ের চরণে যে পূজার ডালি নিবেদন করিলেন, মাতৃভক্ত মাত্রেই তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন এরূপ আশা করা যায়।

সময় বুঝিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদে, যখন তিনি একে একে সংসারের সকল প্রকার অনুকূল অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে মাথার উপরে যে শাণিতকৃপাণ ঝুলিতেছিল, তাহার উচ্ছেদ করিয়া সন্তানবৎসল পিতাকে সর্ব্ব অবসাদ হইতে মুক্তি দিয়া পুত্রোচিৎ কার্য্য করিলেন। ইহাতে তিনি যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন তাহা বলা বাহুল্য। এইবারে তিনি মাথা তুলিয়া দশের কাছে দাঁড়াইবার অবকাশ পাইলেন এবং তাঁহার চিরঈপ্সিত স্বদেশ সেবায় মনপ্রাণ নিয়োজিত করিতে সংকল্প করিলেন। প্রাণ যখন উধাও হইয়া আপনার গন্তব্য পথে ছুটিতে চায় তখন সংসারে এমন কি শক্তি আছে যে তাহাকে রাখিতে পারে? এখন আর অর্থোপার্জ্জনে তাঁহার মতি নাই। তথাপি তাঁহার প্রতি কমলাসনার অযাচিত কৃপা দেখিয়া অনেকেই মনে করিলেন বুঝি বা ধনলিপ্সায় অভিভূত হইয়া তিনি সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতাতেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যতই তাঁহার অর্থাগম হইতেছে, ততই তাহা দশের ও দেশের কাজে উৎসর্গ করিয়া আপনি নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন তখন তিনি যে কি দরের লোক তাহা চিনিতে আর বাকি রহিল না। এ সময়ে পরমারাধ্য পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ হইল। নিষ্ঠাবান্ পুত্র পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এস্থলে সমারোহ অর্থে বহু দরিদ্রনারায়ণের সেবা বুঝিতে হইবে। শ্রাদ্ধবাসরে তাবৎ দিনমান তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া সহস্র সহস্র দীন ভিখারীকে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। কর্ম্মচারী এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল, "আমার বাবা যা

যা খাইতে ভালবাসিতেন আজকার দিনে সেই সকল খাওয়ার আয়োজন রাখিতে হইবে। ইহারা দরিদ্র বলিয়া যেন ইহার অন্যথা না হয়"। ফলতঃ যে প্রাণ দরিদ্রে নারায়ণের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, সে প্রাণ যে দরিদ্রকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারে না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছ ধনমীশ্বরায়" যিনি আপনার জীবনে এ আদর্শ রাখিয়া চলিতে পারেন তিনিই সকলের পূজার্হ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এই দুশ্ছেদ্য জাতিভেদ প্রথা তাঁহাকে বড় পীড়া দিতে লাগিল। কিসে ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে সে চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিতে পারিলে, কালে এ সমস্যার অনেকটা মীমাংসা হইতে পারে—বুঝিয়া, বহু বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের সহিত ইহার বিধি ব্যবস্থার আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাদের অনেকের মতে ইহা শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া জ্ঞাপিত হইলে, তিনি আপন ধর্ম্ম সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিশেষ তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসমতে "যাহাকে একমেবাদ্বীতিয়ম্" বলিয়া জানি তিনিত এই জলে স্থলে নভোমণ্ডলে ওতপ্রোতভাবে প্রতি অণু-পরমাণুতে বিরাজিত। তিনি ভিন্ন ও এজগতের কিছুরি অস্তিত্ব সম্ভবেনা। তবে আর সাকার, নিরাকার মূর্ত্তি অমূর্ত্তিতে ত আসলে পার্থক্য কিছুই থাকিতে পারে না। তা বলিয়া কেহ যেন Symbolism আর Idolateryর তফাৎ বুঝিতে ভুল না করেন। যে আকার বদ্ধ

মূর্ত্তিতে অনঙ্গ আত্মা অনুদিন অনুলিপ্ত সে যে সাকারেই নিরাকার, আবার নিরাকারেই সাকার।" তাই তিনি বাহিরে ধর্ম্ম সমাজ বদলাইলেও তাঁর অন্তরের ধর্ম্ম একই রহিল বিবেচনা করিয়া, তিনি আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তারপর আপন দুহিতাকে হিন্দুশাস্ত্র বিধি মত অসবর্ণ বিবাহ দিয়া ঘোরতর আন্দোলনের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন চিত্ত আপন বিবেকবুদ্ধি মত পরিচালিত হইয়াছে জানিয়া, বাহিরের স্তুতি নিন্দাতে সম্পূর্ণ অবিচলিত রহিলেন। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবদ্দশায় এরূপ কয়েকটী বিবাহ ঘটাইতে পারিলে তাহার ভবিষ্যৎ আশা পূর্ণ হইবে। এই অল্পকাল মধ্যেই এরূপ দুই চারিটী সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি পরম আশান্বিত হইয়াছেন।

যখন তিনি এ ভাবে তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ দেশের কাজে ঢালিয়া দিতে ব্যস্ত, তখনও বড় বড় মোকদ্দমার হাত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বভাব যখন তিনি যে কাজের ভার গ্রহণ করেন, অনন্যমনে তাহা সংসাধন করেন। এজন্য ২।৪টী মোকদ্দমা এক সঙ্গে লইয়া যদি কোনটাতে ন্যায্য সময় না দিতে পারিয়াছেন, তবে অমনি সে কাগজ পত্রের সঙ্গে তজ্জন্য গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন। আইনতঃ সে টাকা ফিরাইয়া দিবার বিধি নাই জানিয়াই তাঁহার মক্কেলরা তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সততা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া পারিত না। কত সময় দীন দুঃখীর মোকদ্দমা বিনা পয়সায় করিয়া দিয়া আপনার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

স্বভাবতঃ স্পষ্টভাষী, কপটতাবিহীন ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ বলিয়া তিনি

কথনও কাহারও খোসামোদী বা চাটুকারিতা করিতে আদৌ পছন্দ করেন না। এমন কি বিচারালয়ের বিচারপতির নিকট হইতেও কোন অসম্মান সূচক ব্যবহার বা বাক্য সহ্য করেন নাই। সেজন্য ঢাকার রাজবিদ্রোহের মোকদ্দমার সময় তিনি তথাকার বিচার-পতির অন্যায় আদেশ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ সে আদালত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। তাহাতে বাহিরে সে বিচারপতি যতই রুষ্ট হউন না কেন অন্তরে যে ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

অনেকের বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন অতিমাত্রায় শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষী। কিন্তু যে সকল ভদ্রবংশীয় ইংরেজ ইঁহার সহিত মিশিয়া ইঁহাকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারাই জানেন যে জাতিগত ভাবে ইংরেজের প্রতি ইঁহার কোন বিতৃষ্ণা নাই। তবে তিনি ইংরেজ শাসন প্রণালীর ঘোর বিরোধী ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। স্বার্থের খাতিরে উপযাজক হইয়া তাঁহাকে কথনও শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হইতে দেখা যায় নাই। অথচ ইঁহাদের মধ্যে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই। Sir Lawrence Jenkins তদানীন্তন বাংলার প্রধান বিচারপতি চিত্তরঞ্জনকে অসম্ভব খাতির করিতেন। এমন কি কত সময় সে ভদ্রমুখ ইঁহাকে আপনার শয়নাগারে লইয়া গিয়া পরমাত্মীয়ের মত কথাবার্তা বলিতেন। একদিন নাকি Jenkins সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "Calcutta Clubএ এত গণ্যমান্য Indians উপস্থিত থাকেন, আর তোমাকে কেন সেখানে দেখিতে পাই না?" উত্তরে উচিৎবক্তা চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "মহাশয় সত্য কথা বলিতে

গেলে, এস্থলে আমাদের দেশের একটী প্রথার কথা আমার মনে পড়ে। সে প্রথা এই যে আমাদের দেশে সৎগৃহস্থের আঙ্গিনায় একটী চণ্ডীমণ্ডপ থাকে, যেখানে নীচজাতির প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু তাহারি সে আঙ্গিনায় আর একটী প্রকোষ্ঠ থাকে যেখানে সকলের যাওয়ার বিধি আছে। আমার বিবেচনায় তোমাদের Bengal Club আর Calcutta Club ইহার উপযুক্ত উদাহরণ। এই বেঙ্গল ক্লাবে তোমরা কালা নেটিভ্ প্রবেশ রদ করিয়া "কেলকাটা ক্লাব" নামক আর একটী ক্লাবের সৃষ্টি করিয়া, কালা-ধলা সম্মেলনের সুযোগ করিয়া দিয়া যেন আপনাদের বদন্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ এরূপ মনে কর। কিন্তু আমি বুঝি যে, যদি বেঙ্গল ক্লাব হেন চণ্ডীমণ্ডপে কালাবর্ণী নেটিভ্ বলিয়া আমার প্রবেশাধিকার নাই, তবে কাজ কি আমার তোমাদের কালা-ধলাবর্ণী-রফার শ্রীঘরে হাজরি দিয়া সে কাল দাগ আরো দাগিয়া দিবার? এতে কালো রঙের মনুষ্যত্বেও যে ঘা পড়ে তোমরা কি তা বোঝ না এমন হতে পারে?" সমাজদার সে সাহেব তখন এই মানীপুরুষের যথার্থোক্তি শুনিয়া, কেবলমাত্র "I see, I see" বলিয়া সে প্রসঙ্গ ক্ষান্ত দিলেন। কিন্তু তদবধি চিত্তরঞ্জনের প্রতি ইহার আন্তরিক শ্রদ্ধা কত বাড়িয়া গেল, তাহা তাহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে স্পষ্টই বোঝা গিয়াছিল।

আবার ভারতসচিব লর্ড মণ্টেগো যখন ১৯১৬ সালে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন হঠাৎ একদিন চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে টেলিফোন আসে যে অমুক দিনে সরকার বাহাদুর লাটভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। প্রথমে চিত্তরঞ্জন মনে করিলেন যে

অন্যের নামে ভুলে তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে এবং সেই মত উত্তর করিলেন। কিন্তু একথার পরেও যখন ফোনে জানান হইল তাহারা সি, আর, দাসকেই চান অন্য কাহাকেও নহে, তিনি এ রহস্য বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। কেননা রাজ প্রাসাদের কোন ব্যাপার উপলক্ষে সি, আর, দাসের কখনও ডাক পড়িয়াছে এরূপ তাঁহার স্মরণে হয় না। যাহা হউক কৌতূহলী হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজকর্ম্মচারিগণ সাদরে তাঁহাকে সরকার বাহাদুরের সন্নিধানে লইয়া গেল। তৎপর ইংলণ্ডীয় প্রথানুসারে অভ্যাগতের করমর্দ্দন-রূপ প্রাথমিক শিষ্টাচারবিধি সমাপন করিতে গিয়া দেখিলেন ভারতসচিবেরও দক্ষিণ হস্ত তৎযোজনার্থে প্রসারিত। তখন জানিতে পারিলেন যে ইহারি আদেশ মত তিনি এখানে আহূত হইয়াছেন।

কিছুক্ষণ অন্য কথাবার্ত্তার পর রাজনীতি মূলক ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতেই গবর্ণর বাহাদুর একটু রুক্ষ ভাবেই বলিলেন, যে ভারতবাসী এখনও সে অধিকার পাওয়ার মত শিক্ষিত হয় নাই। তখন আত্মাভিমানী চিত্তরঞ্জন অমনি উত্তর করিলেন, “যদি এই একশত পঞ্চাশ বৎসরকাল আমাদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াও তোমরা আমাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষিত না করিয়া থাক তবে সে কাহার দোষ?” তখন তদধীন জনের এই স্পর্দ্ধাবাক্য শ্রবণ করিয়া রোষপরায়ণ সেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সহজ আরক্তিম আনন সবিশেষ রক্তাভ ধারণ করিল। তিনি আর বাক্যস্ফুট না করিয়া তথা হইতে

প্রস্থান করিলেন। ভারতসবিচ কিন্তু এতৎ প্রসঙ্গে একটী নির্ভীক চিত্তের পরিচয় পাইয়া ভারতের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের বহু দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় চিত্তরঞ্জনের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রায় ঘণ্টা দুই কাল কথাবার্ত্তার পর ইঁহাকে বিদায় দিলেন। ভাবিয়া দেখিলে শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সাক্ষাতে ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী কখনও এমন উচিৎ কথা বলিতে সাহসী হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

আর একবার যখন তিনি পূজার ছুটীর অবকাশে বিলাত গমন করেন, তখন তথাকার উচ্চপদস্থ তাঁহার এক বাঙ্গালী বন্ধু তাহাকে Lord Morleyর সহিত পরিচয় করাইতে তাঁহাকে লইয়া যান। কথা প্রসঙ্গে মর্লি সাহেব জিজ্ঞাসা করেন "Are you a Native?" চিত্তরঞ্জন হাসিয়া উত্তর করিলেন "Certainly I am." এই অকপট উত্তর শুনিয়া নাকি সে সাহেব এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে পরে তাহার বন্ধু Jenkinsএর (যিনি বাঙ্গালার চিফ জষ্টিস্ ছিলেন) নিকট এই চিত্তরঞ্জনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রাক্ত Jenkins নাকি তখন না বলিয়া পারেন নাই "And this is the man your government wanted to deport" অর্থাৎ এই লোককেই তোমাদের ভারতের কর্ত্তৃপক্ষগণ নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন।"

তারপর আজকার দিনে দেখ, বাঙ্গালার এত এত যোগ্য ব্যবহারাজীবি থাকিতে, এই চিত্তরঞ্জনকে বঙ্গদেশের চরমপন্থীদের অগ্রণী জানিয়াও এখানকার শাসন কর্ত্তৃপক্ষগণ যাচিয়া এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিস্তর পারিশ্রমিক হার দিতে স্বীকৃত হইয়া এই জটিল মিউনিসন বোর্ড মোকদ্দমায় ইঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

সে কিসের লাগি? এমন কি এ মোকদ্দমা হাতে নিবার পূর্ব্বে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবেকবুদ্ধি মত দেশের মান বজায় রাখিয়া এ মোকদ্দমা চালাইতে কর্ত্তৃপক্ষের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবেই তিনি ইহা গ্রহণ করিতে রাজি হইতে পারেন নতুবা নয়। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে ইঁহার অসামান্য দক্ষতা ও বিচক্ষণতার খাতিরে এ সকল চুক্তি সত্ত্বেও ইঁহাকে নিযুক্ত না করিয়া পারিলেন না। এবং তিনিও ইহাদের সম্মতি বুঝিয়া অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তখন কিন্তু এ পক্ষে কোন টাকা কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন কাগজ পত্র ইঁহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া, পরদিন প্রত্যুষেই বিপক্ষ পক্ষ পনর লক্ষ টাকার চেক্ ইঁহার সম্মুখে রাখিয়া করযোড়ে ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। সত্যপরায়ণ চিত্তরঞ্জন তাহাদিগকে শুধু এই বলিলেন, "আমি যখন কর্ত্তৃপক্ষকে একবার মুখের কথা দিয়াছি, তখন ধর্ম্মতঃ আমি তাহাদের কাছে বাঁধা আছি; সুতরাং তোমাদের এই টাকা আমি গ্রহণ করিতে পারি না।" উপস্থিত অর্থলোলুপ ব্যাবসায়িগণ, সংসারের সার এই অর্থে এহেন নির্লিপ্তা দেখিয়া, আপনাদের কার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়া ইঁহাকে সাধুবাদ করিতে করিতে গৃহে গমন করিল। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে গুণীজনের গুণের সমাদর সর্ব্বত্র স্বাভাবিক। মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক এই সহযোগিতা বর্জ্জননীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার বহু পূর্ব্বেই মায়ের এই মানী সন্তান বলিয়া আসিয়াছেন, "আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমকক্ষ ভাবে শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ হইতে সহযোগিতা আদায় (Demand) করিয়া

লইতে পার ত সচ্ছন্দে সে নীতি অবলম্বন কর, আর যদি তা না হয়, তবে নয় কখনই নয়।" তিনি নিজের জীবনে কখনও কোন কার্য্যে বা কথায় ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

চারি বৎসর পুর্ব্বে যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সত্যগ্রহ ব্রত প্রচার করেন, তখন বলিতে কি সমস্ত বাঙ্গলায় এই চিত্তরঞ্জন ভিন্ন আর কেহই চিত্তসংযমের এই মহতী দীক্ষা গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তখন হইতেই ভবিষ্যৎ সঙ্গী মহাত্মা বলিয়াছিলেন "একদিন বাঙ্গলার এই বিশিষ্ট সন্তান দ্বারাই মায়ের সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে।" ফলেও আজ তাহাই হইল।

গত যুদ্ধে জর্ম্মান দিগকে পরাজিত করিয়া গর্ব্বিত ভারত শাসক সম্প্রদায় ভারতে শান্তিপর্ব্বের সূচনা করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই অশান্তি মূলক আন্দোলনের প্রারম্ভেই চিত্তরঞ্জন আর স্বার্থপরের মত অর্থোপার্জ্জনে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে পারিলেন না। তখন চরমপন্থীদের করতলগত জাতীয় মহাসমিতিতে প্রকৃষ্টরূপে যোগ দান করিয়া বাঙ্গলার চরমপন্থীদের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মায়ের সন্তান তখন বাহিরের বিবিধ বিক্ষিপ্ত কার্য্যে বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন নানা স্থানে সভা আহ্বান করিয়া তিনি যে সকল ওজস্বী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে দেশের অবস্থা জানাইয়া দেশের কাজে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার India for Indians এবং Speeches of Mr. C. R. Das নামক গ্রন্থে অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে এতকাল পরে এ ভাবে রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া অনেকেই পরিহাস-

চ্ছলে বলিয়াছিলেন "বৈষ্ণব প্রেমিকের অকস্মাৎ এহেন চিত্ত বিকৃতি হইল কেন?" ইহার যথার্থ উত্তরে তিনি তাঁহার কোন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "Work for my country is part of my religion. It is part and parcel of all idealism of my life. I find in the conception of my country, the expression also of divinity."

বস্তুতঃ এই সকল স্পষ্টভাষী, দৃপ্ত, তেজস্বী পুরুষগণ কেমনে আবার স্নেহে প্রেমে দয়াদাক্ষিণ্যে কোমলতার অবতার হইয়া থাকেন, ভাবিলে মহাকবিদের উক্তি মনে পড়ে—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি,
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহনু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

পঞ্জাবের ব্যাপারে আজ দেশব্যাপী যে অশান্তি তাহার মূলীভূত কারণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত চিত্তরঞ্জন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই সুদূর পঞ্জাবে গিয়া ৪ মাস কাল অবস্থিতি করেন। সেখানে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কয়েকটী দেশ ভক্তের সঙ্গে একযোগে অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয় করিয়া "কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট" নামে যে প্রকাণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিলে ক্ষোভে দুঃখে হৃদয় জ্বলিয়া উঠে। এ সকল অত্যাচারের কোনই প্রতি বিধান হইল না দেখিয়াই মহাত্মা গান্ধী আজ এই সহযোগীতা বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিতে দেশবাসীকে আদেশ করিতেছেন। প্রথমে এই বর্জ্জন নীতির সকল প্রস্তাব সাকুল্যে গ্রহণ করিতে চিত্তরঞ্জনের মতদ্বৈধ ছিল। এবং তাঁহারি আহ্বানে আপন আপন মতামত প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতায় এক স্পেশেল কংগ্রেসের

বৈঠক হয়। এখানেও ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ায় সাম্বৎসারিক কংগ্রেস জাতীয় সমিতিতে নাগপুরে সকলে সমবেত হন। সেখানে বহুবিধ আলোচনার পর উভয়ের মতামতের মধ্যে একটা রফা করিয়া মহাত্মা ও তিনি সমগ্র দেশবাসীর উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি করিয়া আপনারা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তদবধি ত্যাগপ্রবণ চিত্তরঞ্জন আপনার যথাসর্ব্বস্ব মায়ের চরণে নিবেদন করিয়া এবং দেহ মন মায়ের কাজে উৎসর্গ করিয়া তাবৎ ভারতবাসীকে আজ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিলেন। দৈনিক কোন এক পত্রিকায় এই কথাগুলি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে বাহির হইয়াছিল, "এত বাঙ্গালী ধনী বিলাসী বাবুত নাগপুরে গিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী সকলকে ছাড়িয়া চিত্তরঞ্জনকে ধরিলেন কেন? কারণ চিত্তরঞ্জনে এমন কিছু অনন্যসাধারণ বস্তু আছে যাহার ঠিকমত উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে একটা গোটা মানুষ গড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গলার ভাব ও ভঙ্গী রীতিনীতি একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইবে।"

তাই আজ মনে হইতেছে বুঝিবা বহুকাল পরে মায়ের দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্যই এই মহাপুরুষগণ জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। যে বিশাল ভারত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এতাবৎকাল জগতের চক্ষে হীন হইয়া পড়িতেছিল; আজ কিসের প্রভাবে সে ভারত আপনাকে এ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সমক্ষেত্রে জগতের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে কৃতসংকল্প হইয়াছে? তখন চাহিয়া দেখি সম্মুখে তাপস গান্ধী, কর্ম্মী মহম্মদ আলি, যোগী চিত্তরঞ্জন মায়ের আশীর্ব্বাদে, ধন ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া, বিলাসব্যসনে অনাসক্ত

থাকিয়া, দ্বেষরাগের অতীত হইয়া, সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে আপন আপন কর্ত্তব্য কাজে অগ্রসর হইতেছেন। নাই ইঁহাদের প্রাণে ভববন্ধনের মায়াপাশ নাই। নাই ইঁহাদের হস্তে বাহিরের শাণিত অস্ত্রশস্ত্র নাই। আছে ইঁহাদের অন্তর মধ্যে নিহিত "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" আগ্নেয় মহাস্ত্র আছে ইহাদের চিত্ত মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী মন্মোহন অস্ত্র—যাহার প্রভাবে তাঁহারা দিগ্বিজয়ী হইয়া জয়মাল্যে মাকে বিভূষিত করিবেন।

আজ শুনছ না কি তাদের ডাক "এস ভাই খৃষ্টিয়ান! খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল" চাই মায়ের জয়মাল্য চাই, এস ভাই মুসলমান তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল "চাই মায়ের জয়মাল্য চাই"; এস ভাই হিন্দু! তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী করিয়া বল 'চাই মায়ের জয়মাল্য চাই'। এস এস সবাই এস বল ঈশ্বর; বল আল্লা; বল নারায়ণ; বল বন্দে মাতরম্।" তবে ডাক আজ সকলে মাকে ডাক, মা নামের মধুরতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে মাকে ডাক, ডাক ডাক ভক্তিতে মুক্তি জানিয়া মাকে ডাক। মায়ের পূজার আরতির ঘণ্টা ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠুক। ঐ যে মায়ের আগমনীর সুর কাণে পৌছেছে। আর মা ঘুমিয়ে নাই। মায়ের জাগার মাহাত্ম্যে আজ দেশ উদ্বুদ্ধ, মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত। মায়ের এই ত্যাগী পুত্রেরা আজ ধন্য, ধন্য আজ তাদের এই ভিখারীর বেশ! জাননাকি যে এদেশের ভক্তগণ গাহিয়াছেন :—

ভিখারীর বেশে আপনি হরি,
ঘরে ঘরে ফিরে ছলনা করি

ভজ তারে তুষ্ট করি
বৃন্দাবনে হবে বাস।

হউক হউক তাই হউক ; ভিখারীর ভজনা করে আজ দেশে দেশে বৃন্দাবন সৃষ্ট হউক। আর সে শ্রীবৃন্দাবনে দাঁড়াইয়া শ্রীহরির লীলা মাহাত্ম্যে মায়ের কোলে মায়ের এই পুণ্যাত্মা লক্ষ্মী দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। জানি যে দিন দিনের শেষে ঘাটের পারের নিদান বন্ধু পঞ্চভূতে সংসারের সকল সম্বল সঙ্গে দিতে হবে, যে দিন ভববিভবই এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে বাঁধা রেখে পারের কড়ি যোগাতে হবে, সাথের সাথী এই দেহস্মৃতি এই পদদলিত মাটীতে গিয়া বর্ত্তিবে, তখন শ্মশানের স্ফূর্ত্ত পাচকে প্রোজ্জ্বল হয়ে চিতার বিভূতিকে যজমান রেখে শান্তিবারিধারায় পরিপূত হয়ে এই পুণ্য মাতৃ স্বরূপেই সমাধিস্থ হবেন।

শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা।